অঞ্জলি
১৪২১
ANJALI 2014: DURGA PUJA MAGAZINE

About the Artist: Gopal

Indranil Sen (GOPAL) is a renowned contemporary artist in Houston,TX USA who has exhibited extensively and has produced illustrations for books & magazine covers. He has a fan following from all over the world. He believes his art is a poetry which he writes with his brush.

Gopal's work is notable for its rough beauty, emotional honesty, and bold color. He has covered the entire gamut – watercolors, oil paintings, drawings and sketches. He has reflected individual portraits, impressionist features as well as natural landscape and beauty. He believes in happiness and evokes a feeling of love, tranquility and bliss in all his paintings. To him the world today is full of violence and aberrations so through his art he tries to reach out to the higher intelligence and have his viewers interpret his paintings through their eyes always trying to find an inner meaning to the very existence of life on earth and its ethereal beauty. His work is well represented in private collections all around the country. His art was recently selected to be published by International Contemporary Artist Publication from Athens, Greece and HT Publication London.

He is also attached to various charitable Institutions where his art is auctioned to raise money for the poor and needy or for the empowerment of women in third world countries.

সূচীপত্র

আমাদের পূজো 4

শরৎ এসেছে প্রবাসে 6

ঋতু তর্পণ 7

প্রবাসে দুর্গাপূজোয় হাতেখড়ি 8

“Om” শূন্যতা ও তারও আগে 10

আশ্রয় 12

প্রসঙ্গ : বাংলা প্রবাদ 15

বিয়ের পিঁড়ি(অঙ্কন) 16

প্রাণের সখী 17

বৃত্ত থেকে দূরে 19

রথযাত্রা 22

সিনাই-এর সূর্যোদয় 24

ভেগোলজি : শিল্প সাহিত্যের ভবিষ্যত 29

আমার ভূস্বর্গ দর্শন 33

বিশ্বাস-অবিশ্বাস 35

Amphora Vase 40

Back in the USSR 41

Painting 42

Paper Quilling Art 43

Mark Twain In Historic Elmira 44

Newspapers and Magazines – The Best Learning & Teaching Tool 48

Tami in Cairns 49

Message from the Board

Dear Friends:

The Greater Binghamton Bengali Community is looking forward to the seventh year of celebration of Durga Puja on September 27, 2014. We sincerely appreciate the generous support from our community members and friends to make the celebration a successful and sustainable event. We thank all the volunteers for their enthusiastic involvement in the planning and execution of our program.

This year, the early evening program will showcase local talents and will include a variety of songs and dances. The late evening extravaganza will bring a touch of Bollywood because of the participation of our invited artist Ms. Mampee Nair.

We take this opportunity to invite you for sharing the joy and happiness of this festive time and offer our warm ***'Sharodiya'*** *greetings to you and your family. We keenly look forward to your active participation in the 2014 Durga Puja celebration. Only then, the event will be a grand success.*

Sincerely

2014 Durga Puja Committee
Greater Binghamton Bengali Association
http://www.binghamtonpuja.org/

মমতা ব্যানার্জ্জী
ममता बैनर्जी
ممتا بنرجی
Mamata Banerjee

सत्यमेव जयते

মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
وزیراعلیٰ مغربی بنگال
CHIEF MINISTER, WEST BENGAL

৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

শারদ শুভেচ্ছা

'বাজলো তোমার আলোর বেণু'

শিশির ভেজা শিউলি ভোরে পুজো এলো সবার ঘরে।

শিউলির সুবাস, কাশফুল, নৌকা আর শরতের আকাশে মেঘের ভেলা - এসে গেল আমাদের প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজো। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মা আসছেন, আসছেন ধনী-দরিদ্র, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে উৎসবের আঙিনায় মানুষের আনন্দে সামিল হতে।

আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুয়ে যাক সব মলিনতা, সকল রিক্ততা। মা দুর্গার চরণস্পর্শ বাংলার প্রতিটি ঘরে বয়ে আনুক সুখ, সমৃদ্ধি ও বৈভবের বার্তা। চিন্ময়ী দেবীর মৃন্ময়ী রূপের আবাহন নিয়ে আসুক নববিধানের আশ্বাস আর নবনির্মাণের প্রত্যয়।

আপনাদের শারদোৎসবের আয়োজন সফল হোক। উৎসবের প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে উঠুক আনন্দঘন - এই শুভকামনা রইল।

সকলকে জানাই শারদীয়ার প্রীতি, ভালোবাসা আর অনেক অনেক আনন্দ শুভেচ্ছা।

(মমতা ব্যানার্জ্জী)

শ্রী দিলীপ হরি
সংগঠক, দুর্গাপূজা
দি বেঙ্গলী কমিউনিটি অফ গ্রেটার বিংহ্যামটন
নিউ ইয়র্ক
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

Nabanna, West Bengal Secretariat, Howrah-711 102
West Bengal, India
Tel : + 91-33-22145555, + 91-33-22143101
Fax : + 91-33-22144046, + 91-33-22143528

পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জ্জীর শারদ শুভেচ্ছা বার্তার জন্যে 'গ্রেটার বিংহ্যামটন বেঙ্গলী অ্যাসোশিয়েশন' এর সংগঠকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে আমরা শ্রী দিলীপ হরিকে ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের পূজো

উৎপল রায়চৌধুরী

শরতের গাঢ় নীল আকাশ, আর তার মাঝে ভেসে থাকা পেঁজা তুলোর মতো মেঘ। নদীর বুকে চরের মাঝখানে কাশফুলের সারি। চারদিকেই যেন একটা মন কাঁড়া খুশির আমেজ। পূজো আসছে, মা আসছেন। আমাদের সবার মনের নিভৃতে কোথাও না কোথাও এ ধরনের অনেক স্মৃতি লুকিয়ে আছে। ছেলেবেলাকার সেই চেনা পৃথিবীর অনেক দূরে বসেও পুরনো সেই দিন গুলোর কথা যে পুরোটাই ভুলে থাকবো, তা আর হয়ে ওঠে না। চারপাশে সেই কাশফুলের মাথা দোলানো নেই হাওয়ার খেয়াল খুশীর সাথে তাল মিলিয়ে। নীল আকাশটা অবশ্য আছে, তবে তাতে নেই পেঁজা তুলোর মেঘের ভেলায় চড়ে কোথাও হারিয়ে যাবার অবকাশ। কিন্তু সারা পৃথিবীর কোনে কোনে ছড়িয়ে থাকা অনেক হাজার বাঙ্গালীর কাছে এই ছোটোখাটো অসুবিধেগুলো কোনও সমস্যাই নয়। আমরা কোলকাতা, লন্ডন, কিম্বা নিউইয়র্ক এর মতো মহানগরীগুলোতেই থাকি বা বিংগহ্যামটনের মতো ছোট্ট শহর বা তার আশেপাশেই থাকিনা কেন, নিজের মতো করে পুজোর প্রস্তুতিতে নিজেকে জড়িয়ে দিতে আমরা ভালোবাসি। এই আবেগটুকুকে বলা যায় নাড়ীর টান, রক্তের সম্পর্ক। অনেক কাজের চাপের মাঝখানেও আমরা মা দুর্গার আবাহনের প্রস্তুতির সময়টুকু ঠিক বের করে আনতে পারি। নিজেদের মধ্যে সামাজিক যোগসূত্রগুলো প্রতি বছর নতুন করে আরও একবার আমরা ঝালিয়ে নেবার চেষ্টা করি মাতৃবন্দনার প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এই চেষ্টার মধ্যে আমরা হয়তো বা আমাদের সেই ছোটবেলার অনাবিল আনন্দের ছায়া আবার দেখতে পাই।

অনেক সময় বিশ্বাস করতেই একটুখানি অবাক লাগে যে আমাদের পূজো এবার সপ্তম বছরে পা দিলো। আমাদের লোকবল সীমিত, সেটা মানছি। তবে বাৎসরিক মাতৃবন্দনার উৎসাহে যে আমাদের কোনোও ঘাটতি নেই, সেটুকুও মানতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, অন্যান্য বছরের মতো এবারও সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হবে আমাদের মাতৃ আবাহন।

মনের মধ্যে এবার দু একটা প্রশ্ন বেশ গভীর ভাবেই বিব্রত করছে আমায়। প্রত্যেক বছর আমরা নিয়ম মেনে মাতৃ আবাহনের সাধ্যমতো চেষ্টা করি। তারপর যথারীতি নিয়ম মেনে পুরোহিত মশায়ের মন্ত্রোচ্চারণ শুনে দিই মায়ের চরণে আমাদের অঞ্জলি। ভাবছিলাম অঞ্জলি দেবার সময় আমরা মার কাছে ঠিক কি বলি। তখন মনে হলো মাকে আমরা ভিখিরির মতো বলে যাই, ‘রুপম দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি...’ শুধু দাও দাও মা, আমাকে এটা দাও, ওটা দাও। এবার আমি অঞ্জলি দেবার মন্ত্র হয়তো বলবো সবার সাথে সাথে, কিন্তু মনের ভেতর থেকে এবার আমি মার কাছে চাইবো অন্য কিছু। আমি বলবো, যে এই মুহূর্তে আমি তোমাকে সত্যি সত্যি ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ রূপে দেখতে চাই। সারা পৃথিবীতেই হয়তো এটা সত্যি, তবে বিশেষ করে ভারতবর্ষে আজ নৈতিকতার যে অবক্ষয় ঘটেছে, তা সত্যি তুলনাহীন। ভেবেছিলাম, দিল্লিতে ‘নির্ভয়’ কাণ্ডের অমানুষিক নৃশংসতা হয়তো জাতীয় চেতনাকে জাগিয়ে তুলবে কিছুটা। কিন্তু, কোথায় কি? সারা দেশ জুড়ে বার বার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে একই ধরনের বিকৃত মানসিকতার। যুগে যুগেই হয়তো মেয়েরা এ ধরনের অন্যায়ের শিকার হয়ে এসেছে, কিন্তু আজ ইন্টারনেটের কল্যাণে এসব ঘটনার খবর সবার কাছে অনেক সহজে পৌঁছয়। তোমার কাছে এবার আমি এটুকুই প্রার্থনা করবো যে তুমি তোমার অপার করুনাধারার কণামাত্র দিয়ে আমাদের জাতীয় চেতনাকে জাগিয়ে তোলো, আমাদের নৈতিকতার অবক্ষয়ের এই জোয়ারকে একটুখানি বাঁধন দাও। আমার বিচারে এ মুহূর্তে তোমার কল্যাণী রূপের চাইতেও আমাদের বেশী প্রয়োজন তোমার অসুর নিধনী রূপ। আমাদের এই মানসিক কর্কট রোগের নিরাময় করো মা। যদিও আমি জানি যে কল্যাণময়ী রূপটাই যে তোমার চিরশ্বাশত রূপ, তবু আজকের প্রয়োজন ‘যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা’। অঞ্জলি যখন দেবো, তখন এ মুহূর্তে আর কিছু চাইবার প্রয়োজন দেখিনা মা তোমার কাছে।

সম্পাদকীয়

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি

বাঙালির ধর্ম, সংস্কৃতি, সামাজিকতা সবকিছু মিলেমিশে আছে তার দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে। দুর্গোৎসব বাঙালির বিশিষ্ট ঐতিহ্য আর প্রধান উৎসব। এই পূজার উদযাপনে দেখা যায় শিল্প,সংস্কৃতি, এবং সৌন্দর্য্য বোধের অনন্য এবং সৃষ্টিশীল সমন্বয়। শারদ সাহিত্য এই ঐতিহ্যের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত আছে আবহমান কাল ধরে। আমাদের এই ছোট্ট শহর বিংহ্যামটনের দুর্গাপূজার সঙ্গেও আমাদের শারদীয় সাহিত্যের প্রয়াস অঞ্জলি অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে । গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ ও অন্যান্য সৃজনশীল অভিব্যক্তিতে সাজিয়ে তাই অঞ্জলিকে আপনাদের হাতে তুলে দিলাম । আজকের প্রযুক্তিতে উন্নত সমাজে, অনেক মানুষ ই-বুক পড়তেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। তবুও আপনারা কেউ কেউ যদি অঞ্জলিকে দেখে ও পড়ে আনন্দ পান তবেই আমাদের সাহিত্য প্রচেষ্টা সার্থক হবে। আপনারা যাঁরা সাহিত্য ও শৈল্পিক অবদানের দ্বারা অঞ্জলিকে সম্ভব করেছেন তাঁদের সকলের জন্য রইল আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

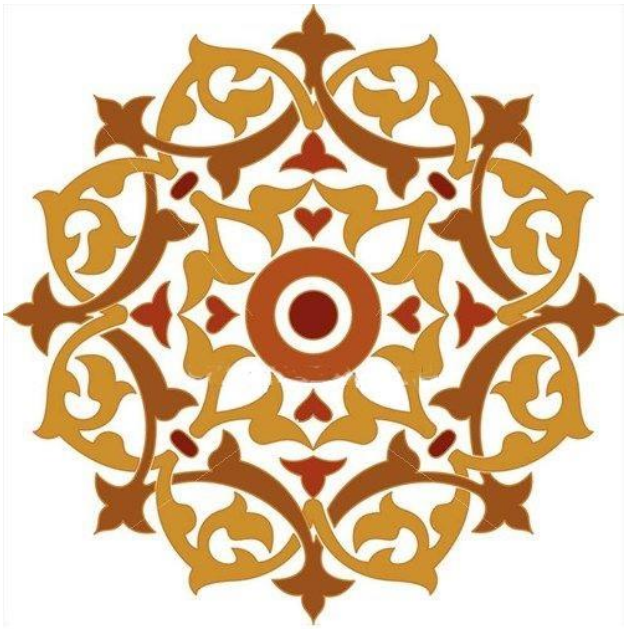

শরৎ এসেছে প্রবাসে

সোহিনী চক্রবর্তী

আজি শরৎ এসেছে প্রবাসে,
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে,
আনন্দ গান বাতাসে,
আজি শরৎ এসেছে প্রবাসে।

মন হল আজ বড়ই উদাস,
সাদা মেঘে মেঘে ভরেছে আকাশ,
দূরে কোথাও ফুটে আছে কাশ,
আগমনী সুর বাতাসে।

সাদা মেঘের ভেলায় চড়ে ,
মা এসেছেন অনেক দূরে ,
মৃণ্ময়ী রূপে নাইবা এলেন
দূর-পাহাড়ের প্রবাসে।

শিউলি ফুলের দেখা মেলা ভার ,
মেপল পাতায় ঢাকে চারিধার ,
তবুও মনেতে খুশির জোয়ার ,
মা এসেছেন প্রবাসে ।।

ঋতু তর্পণ

সন্ধ্যা মজুমদার

তাসের ঘর হতে ধীর পায়ে
বঙ্গের ঋতু চলেছে এগিয়ে
দুহাত বাড়ায়ে দিয়েছে আকাশের পানে
চিত্রকারী, ফটোগ্রাফি নিয়ে নানা বিধার টানে
হীরের আংটি পরে রঙ্গীন তিতলীকে চেয়েছে ধরতে
চিত্র পরিচালক রূপে শ্রেষ্ঠতা চেয়েছে প্রমাণ করতে
চিত্র জগতে নব সংস্কৃতি নবচেতনাকে নিয়েছে আপন করে
বঙ্গ মাঝে নিজ প্রতিভার পরিচয় রেখেছে সর্ব স্তরে,
১৯ শে এপ্রিলে ছিল স্বামী স্ত্রীর নীরব অহংকার
নারীর অভিমানের দুঃখকে সংসার মাঝে করেছ সাকার।
চোখের বালি নিয়ে দেখেছ নৌকাডুবী
অন্তর মহলের সত্য ছবিটাকে দেখেছ চুপিচুপি।
রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সাহিত্যের নতুন স্বপ্ন দিয়ে,
নারীকে করেছ মহিমান্বিত নতুন স্বপ্ন দিয়ে।
সানগ্লাস পরে রেনকোটকে সম্বল করে
এগিয়ে চলো দোসর খুঁজতে নতুন করে।
নিঃসঙ্গ বাড়িওয়ালীর গৃহে করেছ পদার্পণ
আবহমান চলার পথে খুজেছ নতুন জীবন।
দা লাস্ট লীয়রের কাহিনীকে নিয়ে
বুঝতে পেরেছ অসুখ থাকে মনের গভীরে লুকিয়ে,
উৎসবের শুভমহরৎ করে নিজের কাছে
নিজেকে আবিস্কার করেছ চিত্রাঙ্গদার মাঝে,
খুঁজতে চেয়েছ নিজের স্বরূপ সত্যকে
নারী পুরুষের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখনি নিজেকে।
জীবনের পাতায় ঘটছে নিত্য নতুন খেলা
দহনের জ্বালায় জ্বলছে নারীর যৌবন বেলা,
সব চরিত্র কাল্পনিক হয়ে ধরা দেয় নিজের কাছে
সত্যকে তাই খুজেছো বারংবার সত্যান্বেষীর মাঝে।
শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালকের আসনে করি আরোহণ
বাংলা চলচ্চিত্রকে দিয়েছ তুমি নতুন দৃষ্টিকোণ।
অসামান্য প্রতিভা দিয়ে স্বল্প জীবনকে করেছ অমর
তোমাকে স্মরণ করবে আগামী অনেক অনেক বছর।
বঙ্গের ঋতু চলে গেছে আজ জীবনের ওপারে
তব প্রতিভার আসন বিছানো আছে বঙ্গের ঘরে ও বাহিরে।।

প্রবাসে দুর্গাপুজোয় হাতেখড়ি

সুশোভিতা মুখার্জি

সাত সকালে শ্যামল এসে হাজির।

"অনিমেশদা, আর মন্দিরে নারকোল ভেঙে মন ভরছেনা, চল আমরা নিজেরা পুজো করি"

মনে হলো তা মন্দ হয়না। বললাম কি করবি লক্ষ্মী পুজো, না সরস্বতী?

"অনিদা, ওসবে মন ভরেনা, আমরা করব দুর্গা পূজা।

Erie লেক এর তীরে আমাদের ছোট্ট শহরে গোটা দশেক বাঙালি পরিবারের বাস. এখানে দুর্গোৎসব ? শুনে আমার হেঁচকি উঠতে লাগলো।

"বলিস কিরে, সে তো অনেক হ্যাপা, অনেক নিয়ম! যাদের নিমন্ত্রণ করলে একসঙ্গে পাওয়া যায়না, তারা করবে পুজো?"

“তোমার বরাবরই বেশি চিন্তা কত স্বভাব", শ্যামল টিপ্পনী কাটলো। জোর গলায় বলল "ঠিক নামিয়ে দেব".

ফোন তুলে ডাকতে লাগলো লোকজন, "সঞ্জীব-দা চলে এসো, পুজো হবে"।

কিন্তু ঠাকুর পাব কোথায় ? অনেক কষ্টে খোঁজ পাওয়া গেল পাশের শহরে শুভ্রাদির কাছে।

"চলে এসো, আমাদের আগের প্রতিমাটি তো বেসমেন্ট এর শোভা বর্ধন করছেন। তোমরা নিলে তো ভালই হয়"

শুনে আমরা রোমাঞ্চিত। কয়েক বছর আগে শুভ্রাদিদের পুজো দেখেছিলাম। সে তো অতি সুন্দর প্রতিমা! আমাদের উত্তেজনার বাঁধ রইল-না।

অতএব একদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম ! শ্যামল এলো নতুন জামা পরে, আমরা কাচা জিন্স পরে রেডি। বউরা উলুধ্বনি দিয়ে রওনা করে দিলো।

ভাড়া করে ফেললাম এক পেল্লায় U Haul ট্রাক।

সবাইকার ফুরফুরে মেজাজ, শ্যামল মহালয়ার সিডি চালিয়েছে গাড়িতে। সঞ্জীব চালাচ্ছে দৃপ্ত ভঙ্গিতে, সোমেশ আসছে পিছু পিছু।

অবশেষে গন্তব্য স্থলে পৌঁছনো গেল.

শুভ্রাদি তৈরি ছিলেন, বেশ কিছু জওয়ান মার্কা লোকজন-ও দেখি উপস্থিত। আমাদের দেখামাত্র শুভ্রাদি টেনে নিয়ে বসিয়ে দিলেন ভূরিভোজনে, আর ধুপ ধাপ আওয়াজ আসতে লাগলো পাশের ঘর থেকে।

ঢেঁকুর তুলতে তুলতে যখন এসে দাঁড়ালাম বাড়ির বাইরে, তখনই হলো প্রথম প্রতিমা দর্শন।

ঢেঁকুর গেল আটকে, আর সবাইকার মনে একই কথা এলো। মা, তুমি এ কি রূপে এলে আমাদের কাছে?

এতো আমাদের দেখা সেই প্রতিমা নয়. এত মনে হচ্ছে কোনো ছাত্র শিল্পীর ফেলে দেওয়া কাজের নমুনা !

সঞ্জীব আবার অর্থোপেডিক সার্জেন, সে দেখে শুনে বলল অসুরের কাঁধটা দেখছি dislocated, আর সরস্বতীর মেরুদণ্ড খুবই নড়বড়ে। বেশ বড় রকম সার্জারি দরকার।

সোমেশ হলো শিক্ষক, সে মাথা নেড়ে বলল মা বাবাদের মুখে তো কোনো অভিব্যক্তি নেই !

আমি যেই ময়ূরটি তুলতে গেছি, দেখি পালকের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

ফিরে দেখি শুভ্রাদি অন্তর্ধান করেছেন, আর দরজাও বন্ধ।

কিন্তু মা যখন পরীক্ষায় ফেলেছেন উত্তীর্ণ হতে হবে।

মা স্থান পেলেন আমার বেসমেন্টে । মার আগমন হল আমাদের সকলের কোলে ও কাঁধে।

তৈরি হল কমিটি। প্রতিমা সজ্জা কমিটি র মুখ্যা নীলিমা, সে ব্যস্ত নার্স, কিন্তু রোজ সন্ধ্যাবেলা আসতে লাগল আমার বেসমেনটে। হাতে নানা রকম রঙ আর ব্রাশ। রাত নটায় একদিন জানতে পেরেছিলাম তখনও তার খাওয়া হয়নি।

সুনন্দা আর অঞ্জনা গেল শাড়ি জামা কিনতে। প্রশান্ত তার বাবাকে কলকাতায় ফোন করল, তিনি ছুটলেন দশকর্ম ভাণ্ডারে ঠাকুরের অস্ত্র কিনতে। আমরা দিন গুনতে লাগলাম পার্সেল এর জন্য।

সঞ্জীব চলে এল আঠা, পেরেক নিয়ে। সার্জারি চলতে লাগল। শ্যামল তার অফিসের বাগান থেকে কেটে আনল কলা গাছ।

সুমিতা লেগে পড়ল পুরোহিত খুঁজতে। হিন্দুস্থানি মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে কাজ করতে হবে শুনে কেউই রাজি নয়। বিস্তর ফোনের পরে অবশেষে একজন দয়া করলেন। বললেন "সিন্তা লাই পুzo করে দিমু"

পুজো আরম্ভ হল। বাঙালি পুরোহিত নিষ্ঠার সঙ্গে মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন। অকস্মাৎ হিন্দুস্থানি পুরোহিত মাইক নিয়ে সুরেলা গলায় ভজন ধরলেন। বাঙালি পুরুত চেঁচিয়ে বললেন। থামেন, থামে, আমি zoমি ছাড়ুমনা।

অবশেষে পুজা হল সমাপন। সিন্দূর খেলা, মিষ্টিমুখ, কিছুই বাদ রইল না।

কয়েকটি বাঙ্গালির বুক তখন ভরে উঠেছে। সে আনন্দের কি তুলনা আছে?

মার মহিমা অসীম।

“ Om’’

শূন্যতা ও তারও আগে

শাস্ত্রীজী

পরম কৃপালু পরমাত্মার অসীম কৃপাদৃষ্টি নয়, কৃপাবৃষ্টির দ্বারা, এই বাস্তব জগতের, প্রত্যেক জীবাত্মার, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন হোক। এই দেহ জড়িত এবং ক্ষীণ বুদ্ধিতে ব্যাপ্ত, ব্যস্ত ও ত্রস্ত, শরীর থেকে মুক্ত হয়ে , মোক্ষলাভ করুক এই প্রার্থনা। Complete Negation- এর অবস্থা হলে, মানুষ, শূন্যাবস্থা পেতে পারে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে , invention দ্বারা, এমন কোনো প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারিনি, যার দ্বারা পূর্ণ-শূন্যাবস্থা আনা যায়। এই কথা আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। “Total Vaccumanisation is next to impossible and a day, when human being will invent any instrument, that day, the very instrument will destroy the whole world” .

আমরা, সাধনার দ্বারা কিন্তু , ওই শূন্যাবস্থার স্থিতি অর্জন করতে পারি, যখন, আমরা, total forgetful-state –এর অবস্থা অর্থাৎ পূর্ণ শূন্যাবস্থার স্থিতিতে যেতে পারবো। তারপর ওই স্থিতি লাভের পর, এই ভৌতিক শরীর হবে, এক Gigantic Battery। এই শক্তি লাভ হলে, দুটো কাজ করা যায়। হয় সৃজনশীল , নয়তো ধ্বংসাত্মক। তবে একথাও ঠিক তখন সেই ব্যক্তির নিজের ইচ্ছা- শক্তি তাকে চালনা করে না। ঈশ্বর তাকে নৈসর্গিক দৈবশক্তির দ্বারা পরিচালিত করে থাকেন। ঈশ্বর শব্দের অর্থ বহু। ঈশ + বর = ঈশা যুক্ত আশীর্বাদ। ঈশ শব্দের মানে, সৃষ্টিকর্তা, ভালো, ইষ্ট, সুন্দর কল্যাণকারী, সুষ্ঠু, স্বামী, মঙ্গলময়, সদ্বুদ্ধি এবং সদ্গতি প্রদায়ক। ঈশ্বর জীবাত্মার শক্তিকে চালনা করছেন। অদৃশ্যভাবে আত্মার এক অংশ হিসাবে অন্য ভাষায় দেহের দ্বারা আবরিত , এই আত্মা ঈশ্বানুসার স্বাভাবিক ভাবে চালিত হচ্ছে। ঈশ্বরকে বলা হয় সূক্ষ্ম আত্মা পরম আত্মা ঈশ্বর। ঈশ্বর তাঁর ঐশ্বরিক সূক্ষ্ম শক্তির দ্বারা এই জগৎ সংসার বা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। জগতের ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি আত্মার দ্বারা চালিত হচ্ছে। এই জগতে প্রত্যেক মানবের আত্মা বিশুদ্ধ আত্মা। এই বিশুদ্ধ আত্মার উপরের আবরণ তাকে তার স্বরূপ আত্ম স্ব-স্বরূপকে বুঝতে চায় না বলেই এত দুঃখ, কষ্ট , লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ভয়, রোগ এবং ভোগ-ভোগান্তি ইত্যাদি নিজ কর্মের ও চিন্তার দ্বারা সৃষ্টি করে, নিজের জালে জড়িয়ে নিজেকে বাঁচাতে নানা প্রকারের চেষ্টা চরিত্র, পূজা-পাঠ ও মন্দির দর্শন করে, ভাবছে কেন ? কিসের জন্য ? আমি এত দুঃখ, কষ্ট ও মানসিক যাতনায় ভুগে চলেছি ? এর জন্য প্রথমত, দায়ী আমি নিজে। দ্বিতীয়ত, ভুল treatment হলে কি ? দুঃখ, জরা, ব্যাধি , রোগ বা ভব-রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায় ?

আমার মুক্তি বা মোক্ষলাভ জীবনের লক্ষ্য বা target নয়, perfection বা পূর্ণতা না এলে কি ? মুক্তি কি করে আসবে ? কে আমাকে মুক্ত করবে ? আমি নিজেই নিজের মন, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, এবং শরীরকে প্রাধান্য দিয়ে ঈশ্বর থেকে দূরে বহু দূরে , কালো কুঠুরীর অন্ধকারে খুঁজে চলেছি দিব্য প্রকাশের আলো বা Divine Light অর্থাৎ দিব্য শক্তি। Light শব্দের অন্য অর্থ হল হাল্কা। Light thinking মানে হাল্কা বা ফালতু চিন্তাধারা দিয়ে , দিব্যজ্যোতির প্রকাশকে বা ঈশ্বরকে কোনোদিন অনুভূতি, উপলব্ধি সম্ভব নয় বা হতে পারে না। perfection এর অর্থ পূর্ণতা এবং দ্বিতীয় অর্থ পরমাত্মা। উর্দু ভাষায় বলে, জাত বা বিলায়তে ভগিয়া। পূর্ণতার অন্য নাম প্রকৃতি বা Nature। If your nature, coincide with Nature, than everything of the worldly need will come to you, very naturally. আমি আমার স্বভাব, ভাবনা-চিন্তা, বিচার, অভিক্ষণ দিশা, কোনো কারণেই, কোনো প্রকারের পরিবর্তন আনতে রাজি নই। দিশা বদলালে দশা বা অবস্থা বদলায়। কিন্তু আমাকে কে বদলাবে ? কে আমাকে সাহায্য করবে ? কে আমার হৃদ প্রদেশের বীজশক্তির দিব্য প্রকাশ বা দিব্যধারার অনুভূতি

করাবে ? আমি আমাকে সাহায্য করতে বা প্রগতির পথে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক নই !

God fails over there, where human being fails to guide himself in the proper line or wright path. জীবনে পরিবর্তন বা প্রগতি সম্ভব তা একমাত্র শূন্যতা থেকে। তাই আমি প্রথমে আমার নিজের শূন্যাবস্থার স্থিতি আনার জন্য প্রত্যেক প্রকারের যত্ন, প্রযত্ন বা প্রচেষ্টা করবো, যার ফলস্বরূপ ঈশ্বরীয় কৃপা-বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন আসবে। অন্য ভাষায় আমূল পরিবর্তন। তারপর ওই Negation-এর স্থিতিও ঈশ্বরের। তাই আমি যখন ঈশ্বরের আর আমার বিশেষ জ্ঞান , বিদ্যা ও বুদ্ধির খোঁজ করার প্রয়োজন নেই। এমনকি Negation এর পরের স্থিতির দায়িত্ব ঈশ্বরের। ঈশ্বরের যা দরকার উনি তাই করবেন। আমার আর ভৌতিক কোনো প্রকারের ইচ্ছাও নেই তখন ঈশ্বরের ইচ্ছাই ঠিক ও পূর্ণ। ঈশ্বর এই জগৎ সংসার চালাতে কোনো ভুল করেন না। যেহেতু আজ আমি তাঁর জগতে সুতরাং আমার কোনো প্রকারের অসুবিধে বা difficulties-ও এ জগতেই নেই। আমি আজ নিশ্চিন্ত , কারণ আমি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত।

সত্যি কথা বলতে কি ? আমি শূন্যাবস্থাতে এই চিন্তা ও বিচার তাও আমার নেই। এছাড়া ভৌতিক চিন্তাধারা থেকেও মুক্ত। কোনো কোনো মহাপুরুষ এই অবস্থাকে spiritual giant-এর অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন।

আমার লক্ষ্য ত্যাগ নয়। বিবেক ও বৈরাগ্য তাও নয়। মুনি ও ঋষিদের মতন মুক্তি বা স্বর্গ কামনাও নয়। জীবন- মৃত্যুর আনাগোনা বা যাতায়াত, তার থেকে নিবৃত্তি লাভও নয়। আমার লক্ষ্য বা target হল total liberation with a merging condition—অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একাকার যুক্তাবস্থা বা চিরমিলন। নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে , পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হয়ে যাওয়া। একে বলা হয় তদ্-আত্মা বা এক আত্মা অথবা বিলিনীকরণ স্থিতি। কতগুলো কথা লিখলাম, শুনলাম অথবা কোনো সৎসঙ্গে গিয়ে ভজন, কীর্তন, নামধ্যান পূজার স্থল বা মন্দির দর্শন করে আমার কি হবে ? কিংবা গান করে শুনে দুফোঁটা চোখের জল ফেলে ক্ষণিক কালের দেহের ও মনের অবস্থা দিয়ে কি হবে ? বহিরাবরণের স্থিতি হল ক্ষণভঙ্গুর। তার পর পুনর্মুষিকো ভব। যে কে সেই ! পরিবর্তনশীল স্থিতির জন্য না আমি লালায়িত বা কোনো প্রলোভন আছে। আমার চাই চিরন্তন ও শাশ্বত স্থিতি। Polished spiritualized হবার অর্থ নিজের মন ও বুদ্ধিকে সান্ত্বনা দেওয়া যা প্রকৃত ঈশ্বর প্রাপ্তি, অনুভূতি বা উপলব্ধি নয়। আমার কোনো আশা ও আকাঙ্ক্ষা নেই বা আছে কোনো বিশেষ ভগবানের স্বরূপ দর্শনের দ্বারা চর্ম চক্ষুর শান্তি অথবা মুক্তির পথ উন্মুক্ত করা।

পরমাত্মাকে লোকে অনেক নাম দিয়ে পূজা বা গান করে, অথবা দু-চারটে মন্ত্রবলে মনে করে ভগবান খুশি হয়েছেন, এবার ভগবান আমাকে আশীর্বাদ দেবেন। আমি ভব-রোগ থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম। মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হল। মন, বুদ্ধি, চিন্তা, ভাবনা এবং শরীরকে আনন্দ বা সান্ত্বনা দেবার এটা হল এক প্রকার চেষ্টা বা আচরণ। ঈশ্বর কি মানুষের মতন ? আমার চিন্তা-ভাবনায় ও বিচার ধারাতে ঈশ্বর চলেন ? কি বিরাট ভুল করে চলেছি ? ভুল করব আমি তাই ভুলের খেসারত বা মাসুল দিতে হবে না ? ভুল করে, ভগবানকে বলব, " হে ঈশ্বর তুমি আমাকে রক্ষা কর"। ঈশ্বর বলছেন, " হে অবুঝ , তুই হলি তুই। আমি হলাম আমি। আমি রূপ-রস-বিহীন invisible। আমাতে আমিত্বও নেই। দেহ, মন ও বুদ্ধির দ্বারা আমি চালিত হই না। তাহলে আমাকেও মানুষের মতন দেহধারণ করে, পৃথিবীর দুঃখ ও কষ্ট এবং বার বার বিভিন্ন যোনীতে জন্মগ্রহণ করতে হত। আমি ক্রিয়া ও কর্মের উর্ধ্বে। আমি শব্দবিহীন স্তব্ধতা। সূক্ষ্ম আত্মার অংশরূপ কিন্তু অতি সূক্ষ্ম পরমাত্মা।যেদিন তুমি সাধনার দ্বারা সহজ অবস্থা বা পূর্ণ শূন্যাবস্থার স্থিতি আনবে সেইদিন আমার (ঈশ্বরের) সঙ্গে , যুক্তাবস্থার স্থিতি লাভ করে পরাবস্থার স্থিতিতে বিরাজমান করবে"।

*(পুনঃ মুদ্রিত)

আশ্রয়

প্রভাত কুমার হাজরা

রমাকান্ত নন্দী অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় একটা বস্তির সামনের রাস্তা ধরে হেঁটে যায়।প্রায় রাস্তার উপরে মানিকলালের বাড়ি। ওর বাড়ির সামনে এসে রমাকান্ত একটু দাঁড়িয়ে থাকে আর দেখে একটা কুকুর বসে থাকে। কুকুরটাকে দেখতে রমাকান্তের খুব ভাল লাগে। সত্যি কথা বলতে কুকুরটার উপর রমাকান্তের বেশ মায়া পড়ে গেছে। তাই ও কুকুরটাকে দেখতে আসে। কুকুরটাও যেন রমাকান্তের অপেক্ষায় বসে থাকে। রমাকান্তকে দেখলে কুকুরটা আহ্লাদে গলে পড়ে। মাটিতে শুয়ে লেজ নাড়ে। আবার হঠাৎ উঠে সামনের পা রমাকান্তের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে পড়ে। এমনি করে কিছুদিনের মধ্যে রমাকান্তের সঙ্গে কুকুরটার বেশ জানা পরিচয় হয়ে গেছে। কুকুরটা মানিকলালের। ওর মাথা থেকে ল্যাজ পর্যন্ত কালো চুলে ঢাকা। মানিকলাল কুকুরটাকে "কালু" বলে ডাকে। কালু ভীষণ রোগা। মানিকলাল ওকে ভাল করে খাওয়াতে পারেনা। ভাত আর মাছের কাঁটা এই সব খেতে দেয়। মানিকলাল গরীব। ওর বাড়ির সামনে বসে ও তেলে ভাজা আর ফুলরি ভেজে বিক্রি করে। মানিকলাল বুঝতে পারে ওর কাছে থাকতে কালুর কষ্ট হয়। কিন্তু কি আর করতে পারে।

অন্য দিনের মত আজকে রমাকান্ত অফিস ফেরত মানিকলালের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ মানিকলাল ওর বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। শুধু বিচলিত নয়, কাঁদ কাঁদ ভাব ওর চোখে মুখে। কোনও ভূমিকা না করে ও রমাকান্তকে বলল---"বাবু, আমি জানি আপনি কালুকে---" ও একটু থামল। তারপরে বলল—" আমার কুকুরটার নাম কালু। আপনি কালুকে ভালবাসেন। আর কালুও আপনাকে খুব ভালবাসে। আপনাকে দেখলে কালু গলে পড়ে। আপনি কালুকে আপনার বাড়িতে নিয়ে যান। আপনার বাড়িতে ও ভাল থাকবে।" রমাকান্ত বেশ অবাক হয়ে বলল---" সে কি? কালু তোমার কুকুর। তোমার কুকুর আমাকে দিয়ে দেবে কেন?" মানিকলাল একই সুরে বলল---" আমি কালুকে আর আমার কাছে রাখতে পারবনা। কালু অন্য লোকের বাড়ির সামনে রাস্তা নোংরা করে দেয়। মাঝে মাঝে কোথা থেকে হাড় গোড় নিয়ে এসে লোকের বাড়ির সামনে চিবোয়। বস্তির লোকেরা বিরক্ত হওয়ে আমাকে গালাগালি দেয়। আজ অমূল্যর ছোট ছেলের কাছে কালু ছুটে খেলা করতে গেছল। ছেলেটা ভয় পেয়ে মাটিতে পড়ে গেছল। তার মাথায় চোট লেগেছে। বস্তির লোকেরা ক্ষেপে উঠেছে। ওরা আমাকে শাসিয়েছে যে কালুকে বস্তি থেকে না তাড়িয়ে দিলে ওরা কালুকে মেরে ফেলবে।" রমাকান্ত বলল---"তুমি কালুকে বেঁধে রাখো না কেন?" মানিকলাল প্রায় কেঁদে ফেলল। বলল---"ও কথা বলবেন না বাবু। বেঁধে রাখলে কালু বড় কাঁদে। তখন আমি সহ্য করতে পারিনা। এই তো সেদিন কর্পোরেশনের কুকুর ধরার লোক এলো। তারা রাস্তা থেকে সব কুকুর ধরে নিয়ে গেল। কিন্তু কালু তখন রাস্তার একটা খালি বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। তারা কালুকে ধরতে পারেনি। লোকগুলো চলে যাবার পরে রাস্তা থেকে আমি কালুকে তুলে নিয়ে এলাম। মনে মনে বললাম ও একটা আশ্রয় পেলো। তা না হ'লে কালু একদিন ধরা পড়বে আর প্রাণ হারাবে। কিন্তু সেই রাত্রে কালুর কি কান্না। ও কাঁদছিল ও হয়ত দেখেছিল ওর মাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বাবু ও তো কথা বলতে পারে না। তাই ও কাঁদলে আমার সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে। তাই কালুকে বেঁধে রাখতে কষ্ট হয়। আপনি কালুকে আপনার বাড়িতে নিয়ে যান। ও ভাল থাকবে। একটা আশ্রয় পাবে।" এত অল্প সময়ের মধ্যে মানিকলাল এত বড় একটা অনুরোধ করে বসল। রমাকান্ত তখনই "হ্যাঁ" বা "না" বলতে পারলনা। কেবল বলল---"আমি কাল আসব। তখন তোমায় বলব। রমাকান্ত বাড়ির দিকে ফিরল।

--- ২ ---

সেদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে রমাকান্ত কুকুরটার কথা ভাবতে লাগল। তার সঙ্গে মানিকলালের কথা। মানিকলাল বলেছিল "কালু ভাল থাকবে। একটা আশ্রয় পাবে।" কথাটা রমাকান্তের খুব ভাল লেগেছিল। তা ছাড়া ওর ছেলে পরেশ অনেকদিন ধরে একটা কুকুর চাই বলে

আবদার করছে। কিন্তু রমাকান্তর স্ত্রী নীলিমা বাড়িতে কুকুর রাখতে ঠিক রাজী নয়। ও ভাবল প্রথমে নীলিমাকে একবার জিজ্ঞেস করবে। তারপর কালুকে আনবে কিনা ঠিক করবে। কিন্তু ভাবল যে নীলিমা যদি একবার না বলে দেয় তাহলে সব শেষ। অনেক ভেবে চিন্তে ও ঠিক করল যে নীলিমাকে না জানিয়েই কালুকে বাড়িতে নিয়ে আসবে। কালু একবার পৌঁছে গেলে নীলিমা আর না বলতে পারবেনা

পরের দিন অফিস ফেরার পথে রমাকান্ত মানিকলালের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। কালুকে ওর বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে ও তৈরি হয়ে এসেছে। তবু ও মানিকলালকে জিজ্ঞেস করল---" তুমি কি সত্যিই চাও যে তোমার কুকুর আমার কাছে থাকবে?" মানিকলাল খুব খুশী হয়ে বলল---"হ্যাঁ। তা না হলে ওর আর আশ্রয় নেই।" রমাকান্ত কালুকে নিয়ে বাড়ি ফিরল।

রমাকান্ত যখন বাড়িতে পৌঁছল তখন নীলিমা রান্নাঘরে বিকেলের জল খাবার তৈরি করছিল। কালুকে দেখে ও একটু অবাক হ'ল। তারপর একটু বিরক্তির সুরে বলল---"কুকুর নিয়ে এসেছ। বাড়িতে রাখবে নাকি?" রমাকান্ত ঠিক করতে পারলনা কি করে নীলিমাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলবে। কিন্তু তা আর দরকার হ'লনা। পরেশ তখন কালুকে নিয়ে এমন মেতে উঠেছে যে নীলিমার কোনও আপত্তি টিকল না। কালু রমাকান্তের বাড়িতে থেকে গেল।

--- 3 ---

বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। কালু এখন আর একটু বড় হয়েছে। রমাকান্ত প্রায় প্রতি সপ্তাহে কালুর জন্যে মাংস কিনে নিয়ে আসে। অবশ্য মাসের শেষের দিকে তা পারেনা। নীলিমাও কালুর খুব যত্ন করে। দাঁড়িয়ে থেকে ওকে খাওয়ায়। চান করিয়ে দেয়। নীলিমা এসব না করে পারেনা। তার কারণ পরেশ যে কালুকে ভালবাসে। রমাকান্ত সবই দেখে আর সবই বোঝে আর খুশী হয়ে মুখ টিপে হাসে।

আজ নীলিমাকে একবার বাড়ি থেকে বেরতে হবে। এখন দুপুর। রমাকান্ত অফিসে। পরেশ স্কুলে গেছে। নীলিমা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা লাগালো। তারপরে দেখল কালু আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তার উপর বসে আছে। ও নীলিমার সঙ্গে যেতে চায়। রমাকান্ত আর পরেশ যখন বাইরে যায় তখন ওরা কালুকে সঙ্গে নিয়ে যায়। কিন্তু নীলিমা কালুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে সাহস পেলনা। পথে ঘাটে কি হবে বলা যায়না। তখন নীলিমা ভাবল যে ও যদি একটু পরে বেরোয় তা হলে কালু হয়ত ওর সঙ্গে যেতে চাইবেনা। একটু পরে নীলিমা যখন আবার বেরিয়ে এলো তখন দেখল কালু আবার রাস্তার উপর বসে আছে। নীলিমা বুঝতে পারল কালুকে বেঁধে রাখা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। রমাকান্ত প্রথম দিন যে বকলসে বেঁধে কালুকে নিয়ে এসেছিল সেই বকলসটা নীলিমা খুঁজে বার করল। তারপরে রান্না ঘরের সামনে কালুকে বেঁধে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

কলকাতায় এখন সব জায়গায় চোরের উৎপাত। রমাকান্তের পাড়াতে অনেক বাড়িতে চুরি হতে আরম্ভ হয়েছে। কেবল রাত্রিতে নয়, দুপুরে যে বাড়ি অল্প সময়ের জন্যে খালি থাকে সেখানেও চুরি হত আরম্ভ হয়েছে। নীলিমা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পরেই একটা চোর পাঁচিল টপকে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। কালু চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু কালু বাঁধা আছে দেখে চোর তেমন ভয় পেলনা। চোর প্রথমে শোবার ঘরে ঢুকলো। টেবিলের ড্রয়ারে যা ক্যাশ টাকা পড়ে আছে তা চুরি করে নিয়ে যাবার মত তেমন কিছু নয়। দামী জিনিস সব আলমারির মধ্যে আছে। চোর আলমারির চাবি খুঁজে পেলনা। আলমারির চাবি ভাঙতে হবে। এ সব কাজ ওদের কাছে কিছুই নয়। চোর কোমরের বেল্ট থেকে একটা বড় ছুরি বার করল। কালু তখনও চিৎকার করে চলেছে। চোর তখন বুঝতে পারল যে কুকুরটাকে চুপ না করাতে পারলে বিপদ। পাড়ার লোকেরা সন্দেহ করে ছুটে আসবে। তখন ও ধরা পড়ে যাবে। চোর কালুর সামনে এসে দাঁড়াল। ছুরীটা তখনও ওর হাতে। ওর দয়া মায়া

কিছুই নেই। ও ছুরিটা কালুর গলাতে আমূল বসিয়ে দিল। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কালু মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগলো। তার পরে কালু চুপ করে গেল। ওর সব যন্ত্রণা শেষ হয়ে গেল।

--- 8 ---

কালু মারা গেছে। তার জন্যে রমাকান্তই সব থেকে বেশী আঘাত পেয়েছে। ও ভাবে কালুকে ওর বাড়িতে না আনলেই ভাল হত। আর সেদিন কালু বকলসে বাঁধা না থাকলে ও অন্তত পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারত। ওর মনে পড়ল মানিকলাল বলেছিল---"বেঁধে রাখলে কালু বড় কাঁদে। তখন আমি সহ্য করতে পারিনা।" মানিকলাল সেদিন শুনতে পায়নি। তবু মারা যাবার আগে কালু বাঁধা ছিল। আর অনেক কেঁদেছিল।

কালু যে ভাবে প্রাণ হারিয়েছে, রমাকান্ত সে কথা মানিকলালকে বলবে কেমন করে তা ভেবে পায়না। সেই জন্যে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় ও অন্য রাস্তা দিয়ে ফেরে। শেষে ঠিক করল মানিকলালকে ও সব কথা খুলে বলবে। একদিন রমাকান্ত মানিকলালের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। মানিকলাল রাস্তার ধারে বসে ফুলুরি ভাজছিল। ও সব কথা শুনলো। তারপর তেলের কড়াটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। ওর মুখ পাথরের মত শক্ত। ও বলল---"বাবু, একদিন কালুকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে এসে আমি ওকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। তারপর আপনার অনেক দয়া। আপনি ওকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।" কান্নায় মানিকলালের গলা বুজে এসেছে তখন। ও একটু থামল। তারপরে বলল---" কালুর কথা আমি আর ভাবনা। ওর শেষ আশ্রয় ও নিজেই খুঁজে পেয়েছে।"।

প্রসঙ্গ - বাংলা প্রবাদ

অনাবিল সিদ্ধান্ত

জার্মান ভাষায় একটি প্রবাদ আছে বাংলায় যে-প্রবাদটির আনুবাদ করলে দাঁড়ায় –'যেমন দেশ তেমন প্রবাদ'। স্কটল্যাণ্ডেও আনুরূপ আর একটি প্রবাদ আছে। ওই প্রবাদটির বাংলা করলে লেখা যায় – ' যেমন মানুষ তেমন প্রবাদ'। এই দুটি প্রবাদের তাৎপর্য এই যে , কোনো সমাজে প্রচলিত প্রবাদ ওই সমাজের জীবনচর্যারই দর্পন। কাজেই বাংলা-প্রবাদে যে বাঙালীর বৈশিষ্ট্যই প্রতিফলিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

বাঙালীদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী ? বাঙালীরা বাঙালীদের সম্পর্কে অনেক কুকথা বলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছেন, বাঙালীরা কেরানীর জাত, বাঙালীরা মসীজীবী। বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা বলেছেন, বাঙালী পরনির্ভর, অলস। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গজননীকে সম্বোধন করে বলেছেন ' সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী , রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করো নি '। বাঙালীদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বাঙালীরা সব সময় একমত হতে পারেন না। সুনির্মল বসু বলেছেন, ' যেখানে বাঙালী সেখানে কেবল দল আর দলাদলি' । আবার রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বাঙালী দালালি করতেই পারে , কিন্তু দল গড়ে তুলতে পারে না। বাঙালীদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। যেমন , বাঙালী ভেতো, বাঙালী মছলীখোর, বাঙালী খাদ্যরসিক। বাঙালী কেবল মাছ খায় তা নয় – বাঙালী কেবল মৎস্যাশী নয়, বাঙালী মাংসাশীও বটে। বাঙালী শাকও খায়, মাছও খায়। কাজেই, কোনো বাঙালা প্রবাদে যদি শাক এবং মাছের প্রসঙ্গ থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু যে প্রবাদটির কথা বলছি তা বাঙালীর আচরণের সঙ্গে মানানসই নয়। কাজেই , এই প্রবাদে বাঙালী জাতির বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। প্রবাদটি হল 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা'। এ প্রবাদটি বাঙালী স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বাঙালী কদাপি শাক দিয়ে মাছ ঢাকে না। কেনই বা ঢাকবে ? বাঙালীরা কি (গোপাল ভাঁড়ের গল্পের) মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপণ বিধবা পিসি ? বাঙালীরা মৎস্যপ্রেমে বিড়ালের সমকক্ষ। তাই তাদের কাছে মাছ ধামাচাপা কিংবা শাকচাপা দেবার বিষয় নয়। আমি ছা-পোষা গড় বাঙালীর মতো নিত্য বাজারে যাই। বাজারে গিয়ে শাকও কিনি, মাছও কিনি। কিন্তু কোনোদিন শাক দিয়ে ঢাকিনি। বরং মাছ দিয়ে শাক ঢেকেছি যাতে মাছটাই দৃশ্যমান থাকে। সে-মাছ যদি পদ্মার ইলিশ হয় তবে ওই রূপালি ধবলা কিরণময় মৎস্যনন্দনকে হাতে ঝুলিয়ে দোলাতে দোলাতে বাজার থেকে বাড়ি ফিরি প্রাক্তন মৎস্যমন্ত্রী কিরণময় নন্দ মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতাসিক্ত মনে তাকে সাধুবাদ দিতে দিতে। বাড়িতে মাছ নিয়ে যাচ্ছি একথা বাঙালীঘরের কোনো গোপন করার মতো বিষয় নয়। তবে হ্যাঁ , দুর্মূল্যের বাজারে মাসের শেষে যদি কখনও এক জোড়া তেলাপিয়া কিনতে হয় তখন ওই মাছ দৃশ্যমান রাখার প্রকট প্রবণতা থাকে না। কিন্তু বাঙালী সচেতনভাবে শাক দিয়ে মাছ ঢেকেছে এমন ঘটনা বিরল।

বাঙালী ভেতো , তাই সে শুধু জানতে চায় ' কত ধানে কত চাল ' । 'কত গমে কত আটা' বাঙালী কদাপি একথা জানতে আগ্রহী নয়। বাঙালীরা ভেতো তা নয় , বাংলার কাকেরাও সমপরিমাণ ভেতো। বাংলাদেশে 'ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না '। প্রশ্ন উঠতে পারে , ' গম ছড়ালে কি কাকের অভাব হত ?' কোনো বাঙালী এটা পরীক্ষা করে দেখার অবকাশ পায় নি ; প্রয়োজনও অনুভব করেনি। বাঙালী নিজে ভেতো , তাই বাংলার বায়সেরাও ভেতো।

বাঙালীর ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীর কাছে যা চায় তা হল 'গোলাভরা ধান' । তারা কদাপি গুদাম ভরা গমের দাবি পেশ করেনি দেবীর কাছে। ঈশ্বরীর কাছে বাঙালী ঈশ্বরী পাটনি প্রার্থনা করেছিল 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। ঈশ্বরীর কাছে কোনো বাঙালী এ যাচ্ঞা করে নি , ' আমার সন্তান যেন থাকে ব্রেডে – বাটারে' ।

নুন আনতে বাঙালীর পান্তা ফুরায়, জেলি আনতে ব্রেড ফুরায় – একথা শোনা যায় না। বাঙালী যখন কোনো অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উত্থাপন করে তখনও সে ধান ভানে , তখনও সে ' ধান ভানতে শিবের গীত গায় ' , গম পিষতে পিষতে লম্বোদরের ভজনা করে না। বঙ্গনারীর স্বামী তার স্ত্রীকে ভাত-কাপড় দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিয়ে করে। তাই,বঙ্গনারীর কাছে স্বামী তার 'ভাতার'। ভাত দিলেও তিনি ভাতার , না দিলেও তিনি ভাতার!

বাঙালীর খাদ্য তালিকায় কেবল মাছভাতই আছে তা নয়। এ তালিকা সুদীর্ঘ। চর্ব্য-চোষ্য লেহ্য-পেয় সবই বাঙালীরা খায়। বাঙালীরা জল খায়, দুধ খায়, ঘোল খায়- এমন কি বিড়ি-সিগারেট, গাঁজা পর্যন্ত খায়। মাসের শেষে সংসার চালাতে মধ্যবিত্ত বাঙালীরা হিমসিম খায়, ঠাকুরদা ঠাকুমা দাদু দিদারা আদর দিয়ে নাতি – নাতনিদের মাথা পর্যন্ত খায়। বাঙালীরা ঘুষ নেয় একথা কেউ বলে না, তবে কানাঘুষো শোনা যায় তারা নাকি 'ঘুষও খায়'।

আমরা বলি ' পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায় '। কিন্তু ছাগল সব কিছুই খায় একথা সত্য নয়। সুকুমার রায় জানিয়েছেন যে, ছাগলেরা সব কিছু খায় ছাগনন্দন ব্যা-করণ শিং একথার ভ্রান্তি প্রসঙ্গে বলেছে ,ছাগলেরা সাবান খায় না। বাঙালীর অখাদ্যের তালিকা খুব দীর্ঘ নয়। তবে বাঙালী প্রেমিকার মুখে যখন শুনি, 'ওর কাছে যদি যাও তবে মোর মাথা খাও' তখন মনে হয় প্রিয়জনের মাথা সাধারণভাবে বাঙালীর খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়।

বিয়ের পিঁড়ি – রীতা দাস (শান্তিনিকেতন)

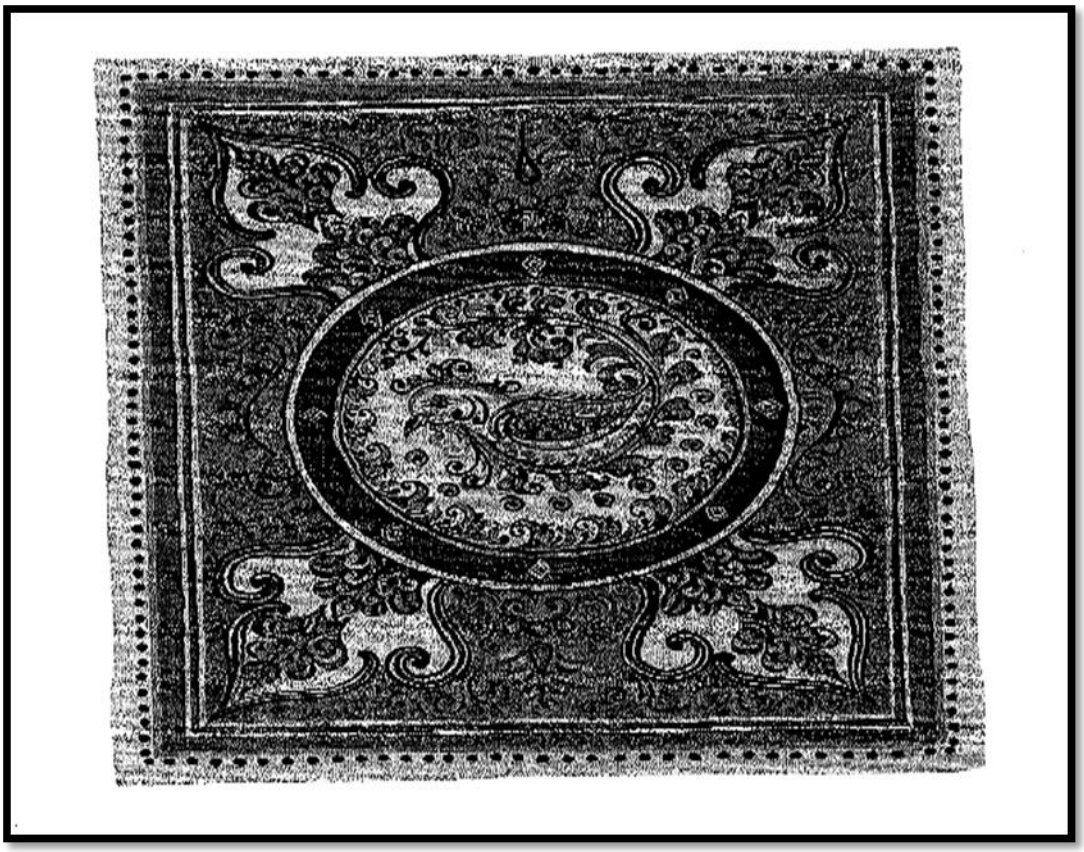

(সৌজন্যে :রুবি বিশ্বাস)

প্রাণের সখী

সুরমা দাশ

সখী যূথিকা : যায় বেলা তোর হেলায় বেলায়,

অবহেলা সবে অবহেলা বেশভূষায়, এখনো বসে তুই পিয়াল বনের ছায়,

এমনি করে কেমনে কাটাবি দিন, নিবিড় বেদনায় যায় যে তোর প্রতিদিন।

আয় সখী চল ঘরে, গোধূলি বেলায়।

দিনের শেষে দক্ষিণ হাওয়ায় মেতেছে আকাশ,

কপোত কূজন ধীরে ধীরে বন মাঝে মিলায়, তোর এলো চুল বসন্তের ছোঁয়ায় ধুলোয় লুটায়,

জানি তোর বিষাদ মন তারে ভুলিবেনা, তোর দুটি সজল আঁখির পাতা দুলিবেনা,

এখনো সময় রয়েছে যে হোসনা হতাশ।

সখী, তুই যে করলি ক্ষত নিজেই নিজের প্রাণে,

তোর বেদনা বাজে আমার বুকের মাঝে, উতলা হই যে তোর কথা ভেবে সকল কাজে,

যার সাথে তব হয়েছিলো তোর পরিচয়, হয় কি তোর কথা তার মনেও উদয় !

জানিবার যে ইচ্ছে হয় আমার ও মনে মনে।"

সখী অতসী : সেই শরত প্রভাতে গিয়েছিলেম পিয়াল বনে

ছিলও সে বসে আপন মনে বেদীর পরে ,গাইছিলো গান ভরাট গলায় আবেগ ভরে,

বিভোর হয়ে শুনলাম গান দাড়িয়ে দাড়িয়ে, বুঝেই পেলামনা কখন মন গিয়েছিলো হারিয়ে,

আমি যেন গুন গুনাতে লাগলাম সেই গান মনে মনে।

নতুন প্রভাতে আবার ছুটে যাই সেথায়,

শিশিরে শিহরন লাগে আমার গায়, আমি চলেছিলাম চুপিসারে পায় পায়,

বসে কোকিল গাইছিলো মধুক শাখে, সদ্য ফোটা ফুলের সুবাস বন মাতিয়ে রাখে,

আমি যে খুঁজে বেড়িয়েছি তাকে, সেদিন দেখেছিলেম যেথায়।

অজানা খুশিতে লাগছিলো রোমাঞ্চ মনের পাতায়,

দূরু দূরু বুকে বাজছিলো কাসার ঘন্টা, চঞ্চল হয়েছিলো আমার শান্ত মনটা,

হঠাৎ করে থমকে দাড়াই বেদীর পাশে, মনে হোলো সে যেনো রয়েছে আমারই আশে পাশে,

ফিরে তাকিয়ে দেখি, সে রয়েছে সেথায়।

হয়েছিলো তার সাথে দৃষ্টি বিনিময় সেই ক্ষণে,

কিছু কথা হয়েছিলো চলতে চলতে পিয়াল বনে, আমি বেসেছিলাম ভালো তাকে মনে মনে,

আমার খুশিতে গাইছিলো কোকিল বসে মগ ডালে, উড়ছিলো সব বিহঙ্গেরা হাওয়ার তালে তালে,

ঝরছিলো প্রেমের মঞ্জুরি, বনের কোনে কোনে।

আমি হয়েছিলাম দিশেহারা তাকে ভালোবেসে,

মাদল বাজে ঐ দূর গাঁয়ে আঁধার রাতে, আমি একা একা কথা কই তারাদের সাথে,

মাতায় বকুলের গন্ধ দূর থেকে দূরে, আমি গাই তারই গাওয়া গান তারই সুরে,

চাঁদের আলোয় কাশফুল সারা দেয় হেসে হেসে।

সখী যূথিকা : হোসনে সখী এত উতলা তারি লাগি,

তাকে পাওয়া এ জীবনে বড়ই কঠিন, তার কথা ভেবে ভেবে হোসনা উদাসীন,

যাবে যে শুকিয়ে নন্দন কানন তোর দুঃখেতে, যেই কাননে ফুলেরা হাসে তোর খুশিতে,

যদি হয় প্রেম সত্য, নতুন সূর্য উঠবে জাগি।

কাল হবে তোর নতুন প্রভাতের নতুন জীবন,

আসবে তোকে দেখতে দূর থেকে পরবাসী, রাখতে হবে তোর মুখ খানি হাসি হাসি,

যত দুঃখ বেদনা রাখবি চেপে মনের মাঝে, দেখাবিনা কোনো শোক তাপ কোনো কাজে,

তাহলে যে পাবে দুঃখ বাবা,মা,আর এই পবন।

নতুন প্রভাতে সূর্যের কিরণে ঘর ভরে গেলো,

কূজিত পাখিরা উড়ে যেতে যেতে কিছু বলে যায়, রঙ্গিন এক প্রজাপতি উড়ে এসে বসে তার গায়,

গুন গুনায় মৌমাছি কানের পাশে পাশে, রঙ্গ বেরঙ্গের ফুল ফুটেছে ঘরের চারিপাশে

অতসীর মুখে এসে পড়লো এক চিলতে আলো।

দুই সখী কথা বলে ধরে হাতে হাতে,

এসে গেছে অতিথিরা বড়ই আনন্দ নিয়ে, যদি হয় মেয়ে পছন্দ নিশ্চয়ই হবে বিয়ে,

অসহায় অতসী এগিয়ে যায় ধীরে ধীরে, যায় যেন প্রাণ তার চিরে চিরে,

চলে তার প্রাণের সখী তার সাথে সাথে।

হোলো তার দৃষ্টি বিনিময় পরবাসীর সাথে,

হাসি মুখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে পরবাসী, অতসীর বুকে আনন্দের ঢেউ উঠে রাশি রাশি,

মেঘে ঢাকা নীল আকাশে উঁকি মারে চাঁদ, ভেঙ্গে ভেঙ্গে পরে যেনো খুশির অশ্রুর বাঁধ,

এই তো সে! যার লাগি সখী মনে মনে মালা গাথে ।

বৃত্ত থেকে দূরে

সৌমিত্র মজুমদার

অরুময় এবং আত্রেয়ী একসাথেই কলেজে পড়াশুনা করেছে । দুজনেই কৃতী ছাত্র । অনেক বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ওরাও একে অন্যের বন্ধু হিসাবেই পরিচিত ছিল - অন্তত: ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাই জানত । কালক্রমে ওরা কখন পরস্পর বন্ধু থেকে প্রেমী-প্রেমিকার স্ব-মহিমায় অবতীর্ণ হল তা ওরা নিজেরাই জানে না । - অথচ আজ থেকে দু'বছর আগেও অন্যান্য বন্ধুদের বলতে শুনেছি " আমাদের এই বন্ধুত্বে একে অন্যের কাছে কোনও চাহিদা নেই,- নেই কোন প্রত্যাশা বা চাওয়া পাওয়ার অঙ্গীকার "

ভালই চলছিল ওদের দিনগুলো - আড্ডা মেরে , কফি শপে বা কোন মলে । কখনও বা সিনেমা থিয়েটার এবং কাছে পিঠে ঘুরে বেড়িয়ে । " বিন্দাস লাইফ স্টাইল " । মানুষের জীবনে এই সময়টা-ইতো " গোল্ডেন টাইম " । কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে চাকরীর খোঁজে একসাথে ' ইন্টারভিউ ' দেওয়া অবশেষে একই অফিসে চাকরী পেয়ে যাওয়াটা নিতান্তই একটা যোগাযোগ বলা যেতে পারে । বন্ধুরা সবাই ভেবেছিল , এবার অরুময় - আত্রেয়ীর বিয়েটা খুব শিগগিরই হবে । এ নিয়ে বন্ধুরা অনেক খেপিয়েছে ওদের । - কি রে ! শুভ খবরটা কবে দিবি ?দুজনেই মিষ্টি হেসে ব্যাপারটাকে এড়িয়ে গেছে ।দুজনেই একসঙ্গে অফিসে যায় । সন্ধেবেলা ক্লান্ত হয়ে নিজেদের বাড়ী ফেরে - এটাই ছিল ওদের রোজকার কর্মসূচী ।

অবশেষে একদিন সব্বাইকে হতাশ করে বন্ধুরা জানতে পারল অরুময় এবং আত্রেয়ী "লিভ - ইনে " আছে । স্পষ্টতই বোঝা গেল সমাজের দ্রুত পরিবর্তনশীল ঢেউ - এ বাস্তব আর কল্পনা-জগতের দোলাচলে বদে গিয়েছে ওদের পুরনো দিনের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি র অঙ্গীকার । এই পরিবর্তিত সমাজে আছে শুধু চাহিদার প্রতিশ্রুতি - নেই কোন দায়বদ্ধতা । কিন্তু ওরা এতেই খুশী । এভাবেই যে কখন পাঁচ - পাঁচটা কেটে গেছে ভাবলে দুজনেই অবাক হয় । প্রতিবছরই ওরা নিয়ম করে ভারতের যে কোন প্রান্তে ঘুরতে যায় ।পাহাড়টা দুজনকেই টানে ভীষণভাবে। বরফ আত্রেয়ীর অতিরিক্ত আকর্ষণ ।

এবার ওরা উত্তরাখণ্ডে কেদার - বদরী যাওয়া মনস্থ করল । যদিও ইতিপূর্বে একবার ঘুরে এসেছে ওখানে । এছাড়া পূর্বেই চষে ফেলেছে সম্পূর্ণ উত্তরাখণ্ড - তবে কোন ধর্মীয় চাহিদা পূরণের জন্য নয় , নিতান্তই হিমালয়ের অপূর্ব সৌন্দর্যের আকর্ষণে । বরফ ভারী ভাল লাগে আত্রেয়ীর ।

সেইমত ওরা প্লেনে কোলকাতা থেকে দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা দিল । ওখান থেকে একটা গাড়ী ভাড়া নিয়ে রওনা দিল কেদার - বদরী অভিমুখে । এই সময়টা অর্থাৎ মে - জুন মাসটা এখানে আসার জন্য আদর্শ সময় । ঠাণ্ডাও কম থাকে বৃষ্টি পাতও উল্লেখযোগ্য নয় । দুই একদিন হরিদ্বার - হৃষীকেশে কাটিয়ে আরও ৭১ কিঃমিঃ ' জার্নি ' করার পর ভাগীরথী , অলকানন্দা ও মন্দাকিনী নদীর সঙ্গমস্থল দেব-প্রয়াগে এসে পৌঁছল । এখানকার অপূর্ব মহীধরের শোভা আর খরস্রোতা নদীত্রয়ের লুকোচুরি খেলা দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই । সেখান থেকে শ্রীনগর , পাউরি , রুদ্র-প্রয়াগ । এখান থেকে কেদার ও বদরীর পথ আলাদা হয়ে গেছে । কেদারের পথ গেছে গৌরীকুন্ড পর্যন্ত । ওরা এই পথটাই বেছে নিল । কথা ছিল ' ড্রাইভার ' ওখানেই থাকবে গাড়ী নিয়ে । কিন্তু কি ভেবে আত্রেয়ী ' ড্রাইভার ' কে অনুরোধ করল গাড়িটা এখানে কোথাও ' গ্যারেজে ' বা ' পার্কিং ' এ রেখে ওদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য । ' ড্রাইভার ' এক কথায় রাজি হয়ে গেল । কিছু গরম জামাকাপড় কেনা হল ' ড্রাইভারের ' জন্য ।

এবার হাঁটা পথে যাত্রা সুরু হল । দূরত্ব ১৪ কিঃমিঃ । এর মধ্যে চড়াই ৪ কিঃমিঃ । পথের দৃশ্য অতি মনোরম । পথ চলার ক্লান্তি মুহূর্তে মিলিয়ে যায় । কেদারে এসে দূরে তুষারাচ্ছাদিত কেদার পর্বতের অপূর্ব শোভা দেখে আত্রেয়ী মুগ্ধ হয়ে গেল । অরুময়কে বলল , মনে আছে দুবছর আগে রূপকুন্ড , হেমকুন্ড দেখতে গিয়েছিলাম আমরা । ত্রিশূল পর্বতের পটভূমিকায় অবস্থিত রূপকুন্ড সরোবর । কি সুন্দর ছিল স্থানটা । বরফে ঢাকা হ্রদ তখন

জমাট । সেখানেই গাইডের মুখে শুনেছিলাম প্রায় পাঁচশো বছর আগে এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে শত শত তীর্থযাত্রীদের মৃতদেহ ওখানে বরফের নিচে চাপা পড়ে আছে । দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার শিকার ছিল ওরা । ইস্ তখন যদি আমি থাকতাম ওখানে ।

- তা হলে কি হোত ? প্রশ্ন করল অরুময় ।

- বরফের বিছানায় চিরনিদ্রায় শুয়ে থাকতাম । কি মজা হোত । বরফ যে আমার খুব ভাল লাগে ।

- যাবে আবার আমাকে ওখানে নিয়ে ?

- আজ্ঞে না , প্রথমত , ঐ স্থানটা অন্যরুটে এবং এখান থেকে অনেক দূরে । তাছাড়া এসব উল্টো পাল্টা কথা কেন ? বরফ যখন এতই ভাল লাগে তো আগামী-বার সুইজারল্যান্ডে যেও । এখন হোটেলে চল , দুজনেই ক্লান্ত , একটু বিশ্রাম নেব চল ।

অবশেষে তিনজনেই হোটেলে চান - টান করে খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম নিল । বিকেলে চা খাওয়ার পর কেদারনাথ মন্দির দর্শন করতে গেল ওরা । এবার কি হোল কে জানে মন্দিরে পুজো দেওয়ার ইচ্ছা প্রকট করল আত্রেয়ী - হয়ত বা কিছু মানত করার বাসনা ।না , বারণ করেনি অরুময় - তবে স্টুডেন্ট ফেডারেশনের ছাত্রীর পূজো - অর্চনার বহর দেখে কিছুটা আশ্চর্য হয়েছে বৈ কি ।

অবশেষে স্থানীয় দোকান থেকে পূজোর ডালা কিনে দুজনেই পুরোহিতের মাধ্যমে মন্দিরে পুজো দিল । আরতি দেখল এবং প্রসাদ খেল । ততক্ষণে অল্পবিস্তর বৃষ্টি সুরু হয়েছে । ওরা হোটেলে ফিরে যাওয়াটাই ঠিক মনে করল । রাতে খেয়ে দেয়ে নয়টার মধ্যেই বিছানায় এলিয়ে দিল নিজেদের , প্রচণ্ড শীতে গরম কম্বলের মধ্যে সঁপে দিল দুটি দেহ একে অন্যকে ।

পরদিন সকালেও একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়েই চলেছে । আজ আর কোথাও যাওয়ার উপায় নেই । খাওয়া - দাওয়া , ঘুম আর গান কানে গুঁজে , বই পড়ে , টি ভি দেখে হোটেলেই কাটিয়ে দিল সারা দিনটা । রাত্তিরে খাওয়া দাওয়া করে সবে শুয়েছে , দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলে দেখল বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে । আগন্তুক হাঁপাতে হাঁপাতে যা বলল তার সারমর্ম এই যে - বাইরে প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে । ধস্ নেমেছে । নদী নালাগুলো প্রচন্ডভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছে । অনেক দোকান - পাট, হোটেল, বাড়ী জলের তোড়ে ভেঙে ভেসে গিয়েছে । এই হোটেলটাও যেকোনো সময়ে ভেঙে তলিয়ে যেতে পারে - সুতরাং এখুনি হোটেল ছাড়তে হবে । অনেকক্ষণ থেকেই লাইট ছিল না । অন্ধকারে টর্চের আলোয় জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে রেনকোট পরে বাইরে বেরিয়ে এল তিনজনে । বাইরে তখনও অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে । কনকনে ঠাণ্ডা তারমধ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকার । বাইরে এসে দেখা গেল ওদের মত অনেক নারী পুরুষ , বয়স্করাও দাঁড়িয়ে আছে খোলা আকাশের নিচে - কোথায় যাবে , কি করবে , কেউ জানে না । ড্রাইভার ভদ্রলোক এখানকার স্থানীয় রাস্তা মোটামুটি চেনে , সেই এগিয়ে এসে রাস্তা দেখিয়ে নিরাপদ স্থানের উদ্দেশ্যে ওকে ' ফলো ' করতে বলল । অন্যান্যরাও সঙ্গে রওনা দিল । কিন্তু কিছুটা এগিয়ে ' ড্রাইভার ' ভদ্রলোকের মাথায় হাত । সমস্ত পরিচিত রাস্তাগুলো এখন আর নেই সব জলের স্রোতে ভেসে গেছে , ওখানে থাকাটাও নিরাপদ নয় , তাই তিনি বললেন , জঙ্গলের মধ্যেকার পাহাড়ি-পথে কোন উঁচু পাথরের টিলায় আশ্রয় নিতে হবে । যা ভাবা তাই কাজ , আত্রেয়ীর হাতটা শক্ত করে ধরে নিল অরুময় । অবশেষে একটা পাহাড়ি টিলায় আশ্রয় নিল । আরও অনেকে এখানে আশ্রয় নিয়েছে । এভাবেই ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সারা রাত কোনরকমে কাটানো গেল ।

অবশেষে সকাল হল । বৃষ্টিটা কিছুটা কমেছে । এখন একটু গরম চা পাওয়া গেলে ভাল হোত । সেই উদ্দেশ্যে রওনা দিল তিন জনেই । কিন্তু কোন হোটেল বা চায়ের দোকানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেল না । তখন ওরা যত দ্রুত সম্ভব এগিয়ে যাওয়া স্থির করল নিরাপদ স্থানের উদ্দেশ্যে । যেতে যেতে প্রকৃতির ধ্বংসলীলা দেখে ওরা বিস্মিত হল । নিজেদের চোখকেই ওরা বিশ্বাস করতে পারছেনা । হেঁটে রওনা দিল গৌরীকুন্ডের উদ্দেশ্যে । কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর দেখল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন । অনেক দোকানপাট , রাস্তাঘাট ভেসে গেছে । কিছু মৃতদেহ পড়ে আছে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অবস্থায় । ড্রাইভার ভদ্রলোক নিজেকে খুব অসহায় বোধ করছে । এদিক ওদিক খোঁজ নিয়ে অন্য একটা পাহাড়ি রাস্তার খোঁজ পেল । রওনা হওয়া গেল সেই পথে । জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ি এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় হাঁটা , কখনও হামাগুড়ি দিয়ে চলা শুরু হল । আত্রেয়ীর খুব কষ্ট হচ্ছিল - কিন্তু কোন উপায় নেই । এখানে থাকাটাও একদম নিরাপদ নয় । পথের নদী নালাগুলো প্রবল বিক্রমে বিকরাল রূপ নিয়েছে ।

আত্রেয়ী আর হাঁটতে পারছেনা। কিছুক্ষণ এভাবেই চলার পরে ভাগ্যক্রমে একটা খচ্চর পাওয়া গেল। অনেক দামের বিনিময়ে রাজী হল। আত্রেয়ীকে খচ্চরের উপর বসিয়ে সঙ্গে চলল ওরা দুজনে। মাঝে মাঝে পথ এত সংকীর্ণ যে চলাই দায় তবুও প্রাণের বাজী রেখে চলতে হল। এভাবে কতক্ষণ চলেছে ঠিক নেই, হঠাৎ একটা বীভৎস কাণ্ড ঘটে গেল। সঙ্কীর্ণ পিচ্ছিল পাহাড়ি পথ থেকে সহসা আত্রেয়ী খচ্চর সহ পড়ে গেল পাশের নদীর স্রোতে এবং মুহূর্তে তলিয়ে গেল। অবসন্ন আত্রেয়ীর একটা আর্তনাদও শোনা গেল না নদীর স্রোতের তীব্র আওয়াজে।

অরুময় ও ' ড্রাইভার ' দুজনেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। এখন কি করা ? পেছন থেকে এক সাধু জাতীয় পুরুষমানুষ হিন্দিতে বলল ' যো গয়া উসে জানে দো, আগে বড়ো, এ হি জিন্দেগী '। এর পরে কি হয়েছে অরুময় জানে না।

জ্ঞান যখন এল, তখন হরিদ্বারের এক হাসপাতালে শুয়ে। ' ড্রাইভার ' ভদ্রলোক সঙ্গে না থাকলে অরুময়ের বেঁচে আসা সম্ভব ছিল না। সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এই মুহূর্ত অবধি এমুহূর্ত অরুময়ের কাছ - ছাড়া হয়নি। খবর পেয়ে অরুময়ের মা, বাবা ওদের বন্ধুরা সবাই হরিদ্বারে এসেছে। এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিল সব বৃত্তান্ত ' ড্রাইভারের ' মুখে। এবার জানতে চাইল কিভাবে ওরা এই পরিস্থিতিতে হরিদ্বার অবধি এল। ' ড্রাইভার ' মাথা নেড়ে বলল সেকথা এখন থাক। আগে বাবুজি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুক। মিলিটারিরা উদ্ধার না করলে আমরা কেউই বাঁচতাম না।

এখন অরুময় কোলকাতায় ফিরে এসেছে, কিন্তু মানসিকভাবে এখনও সুস্থ হতে পারছে না। মাঝে মাঝেই বলছে আত্রেয়ী কেন যে মোবাইলটা ' সুইচ অফ ' করে রেখেছে ! কথাই বলতে পারছি না।

রথযাত্রা

মায়া ব্রহ্ম

'আজ রথযাত্রা' দূরদর্শনের পর্দায় ভেসে চলেছে পর পর মাহেশের রথ,ইস্কনের রথ, পুরীর রথযাত্রা। মন তখন চলে গেছে, কয়েক যুগ পিছিয়ে, আমারও তো একদিন ছোটবেলা ছিল , কবে দেখেছিলাম প্রথম রথ, রথের মেলা। ডুবে গেলাম অন্তরের অন্তস্থলে- যদি কিছু খুঁজে পাই , তাই দিয়ে টুকরো কথার মালা গেঁথে রাখি শেষ বেলায়। গরমের ছুটিতে প্রতি বছরের মত পূর্ব বাংলার টাঙ্গাইল গ্রামে, আমাদের দেশের বাড়িতে গিয়েছি। আষাঢ়ে ভরা বর্ষায় বাবা বললেন আজ রথযাত্রা তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে নাও। আজ তোমাদের সন্তোষের রাজবাড়ির রথ দেখাতে নিয়ে যাব। কি আনন্দ কি আনন্দ। বড়দি , বড়দা , মেজদি , আমি ও দিলীপ বকুল পিসিমার ছেলে। বীথি, যূথি তখন খুব ছোট ওরা যাবেনা , বীথিকে বোঝানো গেল না, বাবার পেছন পেছন ঘুরছে , শুরু হল যূথির বায়না। বাবা ওকে বোঝাচ্ছেন আমাদের পূর্বদিকের ঘরের সার, সার খোলা জানলা দিয়ে দেখা যায় ধান খেত, পাট খেত থৈ থৈ জলে ডুবে বিলের আকার নিয়েছে। ঐ দেখাযায় যমুনার শাখা নদী, পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। সারি সারি নৌকা চলেছে পাল তুলে, জ্যেঠিমা ঘরে এসে বলেন , ঐ দ্যাখ না কত নাও বাদাম খাটাইয়া যাইতাছে। তোগ *রথের* মেলার থিকা বাদাম লেবেন চুষ আইনা দিব। পরে বলেছিলেন ঠাকুরপো লট্‌কা আইন তো। রথের মেলা ছাড়া তো পাওন যায় না। যূথি এক সুরে দু'দিক ঘাড় কাত করে বলে চলেছে বাবা আমাকে এখনি বাদাম এনে দিতে হবে। কিছুতেই তো বোঝে না। মা , জ্যেঠিমা জোড় করে দিদিমণির ঘরে নিয়ে গেলেন। কত দিনের কত কথা যে মনে এসে ভিড় করে , মানসপটে ছবি হয়ে ভেসে ওঠে , কাকে রাখি , কাকে ছাড়ি। অতীত থেকে মুখ ঘুরিয়ে মন দিই লেখায়।

তৈরি হয়ে বসে আছি। বড় পানসি নৌকা বাড়ির পাশে ঘাটে বাঁধা আছে। আমাদের বাড়ির ভীত উঁচু হওয়ায় বর্ষায় জল ঢোকে না। আমরা এসে নৌকায় বসেছি। জাভেদ ভাই বলে , কলের গানখান বাইর করেন ছোটকর্ত্তা মাথায় কইরা লইয়া যাই। কদম ভাই এর হাতে রেকর্ড ভরা চটের ব্যাগ। জ্যেঠিমা বাইরে এসে বলেন , পোলাপান লইয়া যাইতাছো ঠাকুরপো , ভালোয় ভালোয় ঘুইরা আইস। রাইত কইরো না। ভাবেন ক্যান বড় মাঠান , আমরা তো লগেই যাইতাছি। নৌকা ধান ক্ষেতের ওপর দিয়ে সরসর করে চলেছে তরতর করে , খাল বিল ছাড়িয়ে এবার নদীতে নৌকা চলে পাল তুলে। ভরা বর্ষা কুল দেখা যায় না। কচুরিপানার দল ভেসে আসে। মাঝি পেছনে হাল ধরে বসে আছে এক মাঝি, গলায় তার মেঠো সুরের গান। বাবা বলেন , ঐ দ্যাখ সন্তোষের রাজবাড়ির ছাদ ছাড়িয়ে রথের চূড়া দেখা যায়। জানিস তো আমি এই রাজবাড়ির উচ্চবিদ্যালয় থেকে পাস করেছি। রাজবাড়ির চৌহদ্দি যে কত বড় , আম , কাঁঠাল , নানাবিধ ফলফলারির বাগান। উঁচু প্রাচীর ঘেরা সামনে সিংহদরজা বিশাল লোহার গেট। ওপরে দুদিকে দুটো সিংহের মূর্ত্তি যারা গেড়ে বসে আছে। প্রাচীরের ধারে সারিবদ্ধ নারকেল সুপারির ঋজু গাছগুলি প্রাচীর ছাড়িয়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সিংহদরজা আজ সর্বসাধারণের জন্যে খোলা আছে। রাজবাড়ির স্কুলের মাঠে বসেছে রথের মেলা। বড়দা , বড়দির হাত ধরে ধরে আমরা মেলায় ঘুরেছি। ঘাটে নৌকা রেখে , দলে দলে আসছে আশে পাশের গ্রামগঞ্জের মানুষজন। স্ত্রী, পুরুষ , ছেলশ, মেয়ের দল। ছোটদের হাতে একটি করে তালপাতার বাঁশি। বেজে চলেছে উচ্চস্বরে। হরেক রকমের পশরা সাজিয়ে বসেছে গাঁয়ের কুমোরের দল। মাটির খেলনা পুতুল, রান্নাবাটী, পোড়া মাটির ঘড়া কাঁখে , ছেলেকোলে বেনে বৌ। চিনে মাটির সাদা পুতুল। বেতের বোনা ধামা,কুলো , ডালা , ছোট বড় কুনকে ইত্যাদি নিয়ে বসেছে গ্রামগঞ্জের অন্তজ গরীব মানুষেরা। তেলেভাজা, থালার মতো এক একটি পাঁপড় ভাজা কুড়মুড় শব্দ করে খেতে সুভদ্রা কে নিয়ে চলেছেন সাতদিনের জন্যে অনতি দুরেই মাসির বাড়িতে। কত মানুষ যে রথের দড়ি ধরেছে। রজবাড়ির আত্মীয় পরিজনেরা উঠেছেন রথের ওপরে। প্রবীনেরা ধরে আছেন দড়ির প্রথম দিকে। কিছুটা দূরে তাকিয়ে দেখি , দলছুট বেশ কিছু মানুষ , দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে আছে। বাবাকে জিজ্ঞেস করি, এরা কেন রথের দড়ি টানছেনা ! অনেক তো লম্বা দড়ি। বাবা চুপ করে থাকেন। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া একজন মানুষ বলতে বলতে গেল, অরা রথ টান্‌ব কেমনে ? অরাতো মোছলমান। আর ওদিকে অরা হাড়ি, ডোম , মুচি , নিচুজাত। তবে রাজবাড়িতে সব মানুষ আসে , প্রসাদ পায়। যদিও তাদের বসার জায়গা স্বতন্ত্র। বাবা আমাদের রাজবাড়ি ঘুরে দেখালেন। দেখেছিলাম আমাদের বাবার স্মৃতি বিজড়িত রাজবাড়ির স্কুল ও বর্ডিং । হৈচৈ গোলমাল , রকমারি বাঁশির আওয়াজ। সব ছাপিয়ে কানে আসে মিশ্র সুরের তালপাতার বাঁশির ঐক্যতান। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি –

‘ বসেছে আজ রথের তলায় স্নান যাত্রার মেলা ,
আজকে দিনের মেলামেশা যতই খুশী যতই নেশা –
সবার চেয়ে আনন্দময় ওই মেয়েটির হাসি –
এক পয়সায় কিনেছে ও তালপাতার এক বাঁশি । ’

কিছু কেনাও হল । আমার এখনও বেশ মনে আছে , আমি কিনেছিলাম একটি ছোট্ট চিনে মাটির টব । টবের চারিদিকে মাঝে মাঝে সাদা লাইন রেখে , হালকা সবুজের লাইন । মাটির ওপরে মিহি কাঠের গুড়ো দেওয়া , খেজুর পাতায় রং করা ছোট্ট ফুলগাছ , দুটি লাল ফুল ফুটে আছে । এই টবটি আমার বড় সখের ছিল । শ্রীনিকেতনে ফিরে এসে কাঁচের শোকেসে সাজিয়ে রেখেছিলাম । বাবা ভোলেননি জ্যেঠিমার লট্‌কা নিতে । টক্ মিষ্টি খোসা ছাড়িয়ে ভেতরে ২/৩ টি কোয়া , বেশ সুস্বাদু ফল । বাবা এক হাঁড়ি চমচম কিনে জাভেদ ভাই-এর হাতে দিলেন । ফেরার পথে জাভেদ ভাই কদম ভাই বলে , চলেন ছোট কর্তা এ্যালাসিং ঘুইরা বাড়ি ফিরুম । এ্যালাসিং-এর জমিদার বাড়ির রথ দেখেছিলাম বেশ বড় রথ ! সন্ধ্যা হয়ে এসেছে , হ্যাজাক জ্বলছে জমিদার বাড়ির ঘরে ,বাইরে । মেলায় দোকানে দোকানে জ্বলছে হ্যাজাক , লণ্ঠন , কুপি , যার যেমন সঙ্গতি । তেল , ঘি-এর মিশ্র গন্ধে বাতাস ভারী । এসে নৌকায় বসি । অগুন্তি নৌকা , গ্রামগঞ্জের মানুষের সকলের মিলিত আনন্দ । বড়দার কথায় বাবা শচীনদেবের রেকর্ড চালালেন । ও গাহিন গাঙের নাইয়া... । কোন বা প্যাশে যাওরে সাধের ডিঙ্গি বাইয়া ... । বকুল পিসিমার ছেলে দিলীপ ভালো ভাটীয়ালি গান জানতো ও গান ধরেছিল ...

আমি কি দেখেছিলাম গো .. ।
ঐ রূপসী নদীর ঘাটে ,
সে যে কলসী কাঁখে নূপুর পায়ে ।
নাসছে কত ঠাটে গো ... ।
ঐ রূপসী নদীর ঘাটে,
আমি যখন পানসি বাইয়া
যাই গো আপন দ্যাশে
পরান আমার – পইরা রইল
ঐ রূপসী নদীর ঘাটে গো.. ।
রূপসী নদীর ঘাটে ।।

*(পুনঃ মুদ্রিত)
(সৌজন্যে :রুবিবিশ্বাস)

সিনাই-এর সূর্যোদয়

গৌতম সরকার

এতো সুন্দর, এতো মনোরম জায়গা আমি সত্যিই আর কোথাও দেখিনি। পাহাড় আর সমুদ্র পাশাপাশি। পাহাড়ের রং পাটকিলে, আর সমুদ্রের, অবশ্যই নীল। কিন্তু সূর্যের আলোয় সেই পাটকিলে আর নীল রঙের যে কত 'রকম' আর বাহার হয়, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। আর চারি দিকে শুধু বালি আর বালি। এতো বালিও ছিল এ পৃথিবীতে? তারই মাঝে এদিক-ওদিক কিছু ক্যাকটাস জাতিয় গুল্ম; গজিয়ে আছে খাপ-ছাড়া ভাবে। এখানে ওদের উপস্থিতিটা কেমন যেন অযাতিত অতিথির মতো। এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। দেখে মন ভরে গেলো। কিন্তু এখানে আসার আগে এইসবের কিছুই আমার জানা ছিল না। যে জন্যে সিনাই-পেনিনসুলায় গেছিলাম, তা হোল একটা 'অসাধারণ সূর্যোদয়' দেখা। আর তা দেখতে হলে সারা রাত trek করে উঠতে হবে মাউন্ট সিনাই বা মাউন্ট মোসেস-এর ওপর, যার কোলে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো চার্চ, "সেন্ট ক্যাথরিন"। এই পাহাড়ের ওপরেই নাকি Moses স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে "10 commandments"-এর নির্দেশ পেয়েছিলেন, যা কিনা পরবর্তী কালে হয়ে ওঠে খ্রিস্ট ধর্মের অ-আ-ক-খ। এইসব জটিল information comprehend করার ক্ষমতা বা বুদ্ধিমত্তা, কোনটাই আমার নেই। যেটা ছিল, তা হোল ঐ 'অসাধারণ সূর্যোদয়' দেখার একটা ইচ্ছা। 'অসাধারণ' এই কারণে, যে সূর্যটা নাকি পাহাড়ের তলা থেকে মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়, পাহাড়ের ওপর দাঁড়ালে যা কি না মনে হয় যেন পায়ের তলা থেকে সূর্যোদয়।

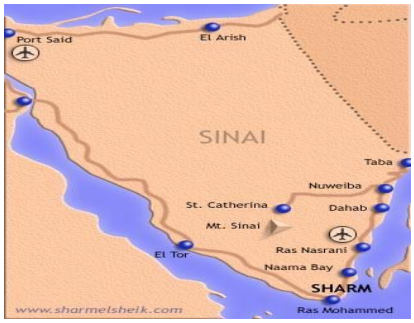

দার্জিলিঙের টাইগার-হিল থেকে আলাস্কার মাউন্ট ম্যাকিনলে, কন্যাকুমারিকার ত্রি-সাগরের সঙ্গম থেকে সাউথ-আফ্রিকার Cape of Good Hope, আমার মিনেসোটার বাড়ির কাছের গ্রেট-লেক সুপিরিয়র থেকে বলিভিয়ার পৃথিবীর উচ্চতম-লেক টিটিকাকা, রাজস্থানের মরুভূমি থেকে আফ্রিকার সাহারা, অ্যারিজোনার গ্র্যান্ড-ক্যানিয়ন থেকে অস্ট্রেলিয়ার উলুরু-রক, এমনকি পেরুর অ্যামাজন জঙ্গলের মাচুপিচু-তেও সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার; কিন্তু তাই বলে পায়ের তলা থেকে মাটি ফুঁড়ে? না:, তেমনটা আগে কখনো শুনিনি। এইসব শুনে-টুনে ঐ 'ইচ্ছা'টা মনে একেবারে জাঁকিয়ে বসল, লোভটা আর সামলাতে পারলাম না। আর যাই হোক, এটা দেখতে গেলে আমাকে ভগবান বা ধর্ম বোঝার মতো কোন অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে না, যা কিনা আমার একেবারেই নেই! তাই ঠিক করে ফেললাম, যে এটা না দেখে আমি মিশর-দেশ ছেড়ে নড়ছি না। কিন্তু আমি ঠিক করলেই বা কি? সেখানে যাব কি করে? রাস্তা ঘাটই যে তেমন নেই; যা আছে তা অতি নগণ্য, আর তারও বেশীরভাগই নাকি বন্ধ। কেনোনা কেউই যে সেদিকে যেতে চায় না। ওদিকে নাকি পদে পদে বিপদ, যুদ্ধ সংক্রান্ত। কারণ আশেপাশের সব দেশই নাকি claim করে যে সিনাই-পেনিনসুলা তাদের, আর তাই নিয়েই যত খেয়োখেয়ি! অনেক কষ্টে একজনকে জোগাড় করা গেলো, একটা private car-এ আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু মুশকিল হোল ভাষা সমস্যা; আমার কাছে আরবি যা, ওঁর কাছে ইংরিজিও ঠিক তাই, একেবারে যাকে বলে 'ভাঁড়ে মা ভবানী'! তাই হাত-পা নাড়ানোই হয়ে দাঁড়ালো বোঝা-বুঝির একমাত্র মাধ্যম। ঠিক আছে, তাইই সই। একদিন ভোরে বেড়িয়ে পড়লাম। Plan-টা ছিল মোটামুটি এই যে কায়রো থেকে সুয়েজ হোয়ে, gulf of Suez বরাবর দক্ষিণে যাওয়া আর একই পথে ফেরত আসা। অন্য কোনও দিকে যাওয়া চলবে না। কারণ মুশকিল হোল আমার আমেরিকান পাসপোর্ট। ঐ জন্যই আমার নাকি ইসরায়েলের গুপ্তচর হবার সমূহ সম্ভাবনা। কারণ ঐ আমেরিকাই যে ইসরায়েলকে ইন্ধন যোগায়। যার জোরেই নাকি ইসরায়েলের এত দাপট, আর সেই দাপটেই নাকি ওরা সিনাই-পেনিনসুলায় 'বাবু' হোয়ে বসে ছিল বেশ কিছুদিন। তিন তিনবার যুদ্ধ করে তবেই সিনাই-পেনিনসূলার বেশ খানিকটা ফেরত পেয়েছে মিশর।

এইসব তথ্য কি আর আমার মাথায় ঢোকে? আমার শুধু ঐ একটাই সম্বল, ঐ 'ইচ্ছা'টা, ঐ 'সূর্যোদয়' দেখার 'ইচ্ছা'টা। তাছাড়া ঐ ২০০০ বছরের পুরনো, লুঙ্গির মতো কি সব ছাল-বাকল পরা, ধ্যারধ্যারে গোবিন্দপুরের Mr. Moses যদি তা দেখে থাকতে পারেন, তাহলে আমেরিকায় থাকা এই আধুনিক আমিই বা তা পারবো না কেন? দুপুর ১২-টা নাগাদ সেন্ট ক্যাথরিন পৌঁছানো গেলো। এই চার্চে নাকি আমার মতো অপবিত্র নাস্তিকের ঢোকা বারণ। কিন্তু আমি যে অপবিত্র তাই বা জানছে কে? ভাবলাম এত দূর যখন এসেইছি, ঢুকেই পড়ি না একবার, কিই বা আর হবে? দেখেই নি না, কি এমন জিনিস আছে এর ভেতরে, যা নিয়ে কিনা মুসলমান, খ্রিস্টান আর ইহুদীদের মধ্যে এত লাঠালাঠি, এত খিটকেল। তাছাড়া পয়সা উসুল করারও তো একটা ব্যাপার আছে, এতো খরচ-খরচান্ত করে এলাম এ্যাদ্দুর ...! কিন্তু ঐ যে বিবেক বোলে কি যেন একটা আছে না? তার জোরাজুরির কাছেই হেরে গেলাম! কেন জানি না মনে হোল যে, আমি এই গির্জায় ঢুকলে বাড়ি বয়ে এসে জোর করে কাউকে অসম্মান করা হবে। তা আমি পারবো না। তাই বাইরে থেকেই দেখলাম। বেশ দেখতে। আমেরিকার মতো বড়, আর নতুন বা 'fast' দেশে থাকলে যা হয়; ৫০০ মাইল কোন দূরত্বই নয়, আর ৫০০ বছর অনেক দিন! তাই দুই হাজার বছরের পুরনো কিছু একটা দেখছি, ভেবে মনে কেমন যেন একটা রোমাঞ্চ আর শিহরন হোল। কিন্তু ব্যাস, ঐটুকুই। Spiritual কিছুই feel করলাম না। মনে মনে একটু হাসলাম, কোন spirit থাকলে তবে না spiritual feel করা যায়, আমার যে এসবের 'কিসুই' নেই! উল্টোদিকে ছোটো একটা টিলার ওপরে একদল খ্রিস্টান লোক কোন একটা 'service'-এ ব্যস্ত ছিল দেখলাম। ওরা যেসব মন্ত্র আউড়াচ্ছিল, তার মধ্যে কেমন যেন একটা শান্তির বার্তা ছিল। ঠিক যেমনটা হয়; যখন সংস্কৃত মন্ত্র বা স্তোত্র 'তেমন' করে, কেউ তেমন 'গলায়' 'পাঠ' করতে পারেন! আমার ছোটবেলায় মহালয়া শুনে ঘুম থেকে ওঠার কথা মনে পড়ে গেলো, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের সে কি অসামান্য দক্ষতায় স্তোত্র পাঠ! ভেবেই গায়ে কাঁটা দিলো। ওঁদের দু-এক জনের পরনে সাদা আলখাল্লার মতো কিছু একটা মনে হোল, হয়তো ওরাই পুরোহিত।

ওঁদের সাথে গিয়ে আলাপ কোরতে ইচ্ছে করলো, তারপর ভাবলাম না থাক, ওঁদের প্রার্থনা ভঙ্গ করবো না, আমিতো আর সে ক্ষমতার অধিকারী হতে পারলাম না,ওঁদের পথেই বা বাধা হবো কেন? এদিক ওদিক ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ালাম বেশ খানিক্ষন। ভাবছিলাম ভগবান বেচারিকে নিয়ে এত মারামারি কেন? নাকি মারামারিটা আসলে জমি দখলের, এই সিনাই-পেনিনসুলার দখল নেবার মতো? আমার তিন মেয়ের কথা মনে পরে গেলো। আচ্ছা, ওরা যদি কোনোদিন আমাকে নিয়ে মারামারি শুরু করে দেয়, তাহলে আমি কোন দিকে যাব? বেচারি ভগবান, ওনার যে কি নিদারুণ অবস্থা! ওনার তো নিজেরই অশান্তির শেষ নেই, আর তাঁর কাছেই কিনা লোকে শান্তি ভিক্ষা করে? একটা আরব বেদুয়িনকেও দেখলাম, উটের পিঠে করে যাচ্ছে। রোদে চটা, কালচে-তামাটে গায়ের রং, আর হাড় গিলগিলে, রুক্ষ চেহারা; খেতে পায় না বোধহয়। গায়ে শতচ্ছিন্ন জামাকাপড়। দেখে মনে হয় বছর কয়েক স্নান করেনি ও, এদিকে জলই বা পাবে কোথায়? পায়ে দেখলাম ছোপ ছোপ মেরে সাদা খড়ি উঠেছে, গায়েও নিশ্চয়ই বোটকা গন্ধ। ওর উটের পিঠেও একটা শতচ্ছিন্ন শতরঞ্চির মতো কিছু একটা, ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যই বোধহয়। দেখে মায়া হোল। আচ্ছা, ওর কি বউ আছে? ছেলে, মেয়ে? তারা কি খেতে পায়? সুখ যে নেই, তা তো দেখাই যাচ্ছে, কিন্তু শান্তি? সেটা কি আমার থেকে ওরই বেশী? কিছু দূরে একটা ঘরের মতো কিছু একটা দেখা গেলো, কুঁড়েঘর আর তাঁবুর মাঝামাঝি কিছু একটা। ওরই হবে বোধহয়। এদিক-ওদিক, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আরও কিছু উট, গুল্ম চিবিয়ে জিরচ্ছে। ওদের demeanor-এও কেমন যেন 'শান্তি'। দেখে মনে হোল যে এই দুনিয়ায় কি ঘটছে, না ঘটছে, তাতে ওদের বোয়েই গেলো। এই আপাত 'অশান্ত' সিনাই-পেনিনসুলায় শান্তি খুঁজে পেলাম এই আমি! প্রাণটা জুড়িয়ে গেলো। ঐ 'শান্তি' দিয়েই আমার lungs দুটোকে ভরে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, আবার কবে যে সুযোগ হবে! কিন্তু সেখানেও বিপত্তি। গাড়ির driver এসে তাগাদা লাগালো, বলল যে এবার মাউন্ট সিনাই রওনা না হলেই নয়। নয়তো ওখানে আর সময় মতো পৌঁছানো যাবে না, কারণ ওঁকে যে আবার এদিকেই ফেরত আসতে হবে রাত কাটাতে, আমি যখন সারা রাত trek করবো; কারণ মনুষ্য সভ্যতা নাকি এখানেই শেষ! আচ্ছা, শান্তি খুঁজে পাওয়াটা কি এতই দুষ্কর? যদি বা এখানে একটু সুযোগ হোল...! কি আর করা? বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে গেলাম মাউন্ট সিনাই। মনে মনে একটু ভয়ই পাচ্ছিলাম, পারবো তো? Driver তো আমায় পাহারের কোলে ফেলে রেখে কেটে পড়বে, আর তারপর? কিন্তু ওখানে গিয়ে বেশ কিছু ইউরোপীয় বিদেশীদের দেখে ধড়ে যেন একটু প্রাণ এলো! তারা দেখলাম সব একেবারে বিলকুল ready, trekking-এর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে।

আর আমি? সাথে শুধু একটা জলের বোতল! ঐ যে বলে না, বাঙ্গালীদের কিসসু হবে না! আমিই তার হাতে-গরম উদাহারন। এখানে নাকি এখন সব জিরচ্ছে, খানাপিনা ঔর, বিদেশীদের যা হয়...। দেখলাম সবই চলছে বেশ ভালো রকম। আমি কি করি, কি করি ভাবতে ভাবতেই বিরক্ত হোয়ে গেলাম। কিন্তু একা একা যে এগিয়ে যাবো, তার সাহসও নেই বুকে। এখানে এসেছি তো একাই, কিন্তু তারপর থেকে এই একাকীত্বের ভয়টা কেমন যেন গ্রাস কোরতে শুরু করেছে আমায়। আর তার ওপর এই ইউরোপীয়দের দেখে আমার অবস্থা, যাকে বলে 'ঘোড়া দেখে খোঁড়া'। কথাবার্তা বলে যা বুঝলাম তা হোল এঁরা রাত ১১-টা নাগাদ trekking শুরু করবে, ওপরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত ৪-টে। তার বেশী দেরী করা যাবে না, কারণ আলো ফুটতে শুরু করে দেবে। এসবের কিছুই আমার জানা ছিল না। শুধু জানতাম যে সকাল ৯-টার মধ্যেই আমাকে নেমে আসতে হবে,কারণ driver আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। শুনে সকলে বলল যে ওটা নাকি কোন ব্যাপারই না, সূর্যোদয় ৬-টার মধ্যেই শেষ, তারপর নামতে ঘন্টা আড়াই, তিনের বেশী লাগবে না। মনে মনে ঠিক করে নিলাম যে এঁদের সাথেই উঠবো।

রাত ১১-টা নাগাদ ওপরে ওঠা শুরু হোল। খুব সুন্দর চাঁদ উঠেছে, রূপসী-কিশোরী যেন। ওর রূপের ছটায় চারিদিক রুপোলী, চিক চিক করে চলকে পরছে সেই রূপ। সেই উপচে পরা রূপের আলোয় পথ দেখে, আর মনে মনে আমাদের সকলের প্রিয় 'সলিল-দা'র "আমরা সবাই মিলে সূর্য দেখব বোলে" গানটা গাইতে গাইতে যখন ওপরে গিয়ে পৌঁছলাম, ততক্ষণে চাঁদ অনন্ত যৌবনা, আর আমার জিভ বেরিয়ে আমি চিতপটাং। ওপরে বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু ঐ ঠাণ্ডাটাকেই বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করলো, ঠিক তাই করলাম। চাঁদের আলোটা উপভোগ কোরতে কোরতে রবীন চাটুয্যের সেই সুরটা মনে পরে গেলো, তালাত মাহমুদের গাওয়া "চাঁদের এত আলো"। নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হোল, যোগ্যতার নিরিখে জীবনে তো কতো কিছুই বেশী পেয়ে গেলাম। ভারতে জন্মানোর সূত্রে এই গানটা, আর আমেরিকায় থাকার দৌলতে মাউন্ট সিনাই! একেই বলে কপাল! অন্তত আমার দাদা আর ভাইটাকে সাথে রাখতে পারলে হয়তো এতটা guilty feelings হোতো না। কি আর করা যাবে, সেটাও আমার কপাল! ছোটবেলায় সহজপাঠে বা কিশলয়ে পড়েছিলাম "একা একা খেলা যায় না, ঐ বাড়ি থেকে কয়জন ছেলে এলে বেশ হয়", আমার সেটাই মনে পড়ে গেল। চাঁদের আলোটা আস্তে আস্তে কমে যেতে লাগলো, আর আকাশটা একটু একটু করে পরিষ্কার হতে লাগলো। আকাশের রঙ বেগুনী থেকে গোলাপি, গোলাপি থেকে কমলা, কমলা থেকে লাল, আর তার সাথে সাথে আরও কতরকমের নাম-না-জানা রঙের পরিবর্তন হতে হতে হটাত সোনালী হোয়ে গেলো! আর তারই ফাঁকে এক মুহূর্তে পাহাড়ের তলা থেকে, আমার পায়ের তলা থেকে বেরোল একটা লাল টুকটুকে রক্তের গোলা, মুহূর্তেই যেটা আবার হয়ে গেলো এক তাল সোনার দলা। মনে হোল যেন হাতে একটা লম্বা বাঁশ থাকলেই ওটাকে একটু ছুঁয়ে দেখা যেত; ওটা যেন কত কাছে, আবার কত দূরেও! তার যে কি রূপ, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব, কেউই পারবে বলে আমি মনে করি না, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও নন। জমায়েত লোকজনদের মধ্যে একটা হুল্লোড় উঠল, তারপর সবাই চুপ। একটা নিস্তব্ধতা গ্রাস করে নিলো সকলকে। আমার নড়াচড়া করার ক্ষমতাটাই হারিয়ে গেলো বেশ কিছুক্ষণের জন্য। তারই মধ্যে কিছু ছবি তোলা, আর দু-এক মিনিটের একটা video record করা।

এরপর নামার পালা। নামতে গিয়ে কত কিছুই মনে এলো, এই পৃথিবীটা কত সুন্দর, আমরা কেন যে এত ঝগড়া-মারামারি করি, এই সব। মাথায় একটা চিন্তা ছিলই, যদি গাড়িটা সময় মতো না আসে, কিম্বা একেবারেই না আসে? মিশরীয়দের সময় জ্ঞানের যা বলিহারি! সময়ের কথা জিগ্যেস করলেই এরা বলে "ইনসা আল্লা", অর্থাৎ কোন ঘটনা সময় মতো ঘটবে কিনা, বা আদৌ ঘটবে কিনা তার পুরোটাই "আল্লা"র মর্জির ওপর নির্ভরশীল। দায়িত্ব এড়ানোর কি সহজ সমাধান। ভারত থেকে সরাসরি এখানে এলে হয়তো এতটা চোখে পড়তো না, কারণ আমাদেরও তো ঐ একই রকম সময় জ্ঞান, যদিও আমরা সচরাচর ভগবানকে এর মধ্যে জড়াই না। কিন্তু জীবনের বেশীরভাগটাই আমেরিকায় থাকার পর? খুবই চোখে পড়ে, বিরক্তি লাগে, আবার হাসিও পায়। চিন্তাটা নিচে নামার সময় তাই মাথায় বেশ ভালোরকমই ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু নিচে নেমে দেখি আমার গাড়ি উপস্থিত, তাতে ঢুকেই গা-টা এলিয়ে দিলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা জানি না, কতক্ষণ যে ঐ ভাবে কেটেছে তাও জানি না। একটা হৈ-হল্লায় ঘুমটা ভেঙ্গে গেলো। দেখি আমার গাড়ি ঘিরে বেশ কিছু লোকজন। তাঁদের হাতে বন্দুক, মাথায় পাগড়ী, মুখের বেশীরভাগটাই ঢাকা, পরনে মিশরীয় 'গালেবেয়া'। ভয়ে রক্ত একেবারে হিম হয়ে গেলো। এঁরা কি একেবারে মেরেই ফেলবে নাকি? মেয়ে তিনটের মুখখানাগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠলো, তারপর সব কিছুই কেমন যেন ঝাপসা। ঘুমের ঘোরে কোন স্বপ্ন দেখছি না তো ।

দেখি ওঁরা আমার driver-টাকে গাড়ি থেকে টেনে নামাচ্ছে। তারপরই বন্দুকধারী একজন গাড়িতে উঠে এলো, আর তন্ন তন্ন করে গাড়ির ভেতরটার তল্লাসি নিল। তারপর আমাকেও নামতে বলল। ভয়ে জড়সড় হোয়ে, থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে আমি নামলাম। আমার কাছে কিছু একটা চাইল। আমার driver আমাকে বোঝাল যে ওঁরা আমার ID চাইছে। আমার পাসপোর্টটা শরীরের একটা গোপন জায়গা থেকে বের করে ওঁদের দেখালাম। তখন ওঁরা আমার দিকে গভীর পলকে তাকিয়ে থেকে, নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করতে করতে, পাশের একটা ছেঁড়াখোঁড়া তাঁবুতে ঢুকে গেলো। আমার পাসপোর্টটা নিয়েই। তার আগে আমাকে কি সব বলে শাসিয়ে গেলো, যার অর্থ একটাই হয় যে; আমি যদি এক পাও নরি, তো আমার জান খতম। কিন্তু নড়ে যাবই বা কোথায়? পাসপোর্ট ছাড়া? বেশ কিছুক্ষণ পর ওঁরা ফিরে এলো, আমার পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে। ধরে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। কিন্তু পাসপোর্টটা ফেরত দিলো না। উল্টে বলল জামা-কাপড়-জুতো-মোজা সব খোলো। খুললাম। জামা-প্যান্টের পকেটগুলো ভালো করে search করলো, জুতো জোরাও। তারপর বলল যেটা বাকি আছে, সেটাও খুলতে হবে, অর্থাৎ আমার underwear! আমি ভাবলাম, কি বিপদ, এটা আবার কেন? ইতস্তত কোরতে লাগলাম। কিন্তু ওদের আরবি কথাবার্তা থেকে যা বুঝলাম তা হোল "অত সহজে চিঁড়ে ভিজবে না চাঁদু, তুমি ওখান থেকেই তোমার পাসপোর্টটা বার করেছো, সুতরাং ওখানে আরও কি কি লুকানো আছে তা আমরা দেখতে চাই"। আমার ড্রাইভারের দিকে আকুতি নিয়ে একবার তাকালাম, যে তুমি অন্তত এদের ভাষাটা জানো, কিছু একটা করো। কিন্তু ওঁর চোখের ইশারায় যা বুঝলাম তা হোল, ওঁরা যা যা বলছে আমার তাই করাই শ্রেয়। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে এ আর এমন কি? Gym-এ গিয়ে সাঁতার কাটার পর, বা র‍্যাকেট-বল খেলার পর এমন তো প্রায় প্রতি সপ্তাহেই করে থাকি; men's locker room-এ সকলের সাথে উদোম হোয়ে স্নান করি, দাড়ি কামাই। এমনটাই তো করে আসছি আমেরিকায় যাওয়া ইস্তক! ওখানে তো এটাই রেওয়াজ। সুতরাং এতে আর ঘাবড়ানোর কি আছে? বুঝতে পারলাম যে আমার এই আমেরিকান পাসপোর্টটাই এই মুহূর্তে আমার যত বিপত্তির কারণ। তাই ওঁদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আমি আদতে ভারতীয়। কায়রো, আর মিশরের অন্যান্য বেশ কিছু জায়গায় দিন কয়েক আগেই ঘোরার সুবাদে জানতাম যে এই মিশরীয়রা আমাদের Bollywood-এর ছবির খুব ভক্ত, TV-তে এখানে সারাদিনই হিন্দি ছবি দেখানো হয়; আরবি-subtitle সমেত। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে আমার এই ধারনাই হয়েছে যে, ভারতীয়দের ওপর বিশেষ কারো তেমন কোন রাগ নেই; যদিও এখনো আমার পাকিস্থান ভ্রমণের সৌভাগ্য হয়নি। বরং, আমাদের সম্পর্কে অনেকেরই 'শান্ত-শিষ্ট-ল্যাজ-বিশিষ্ট' এই ধরনের একটা ধারনা আছে। তাই আমার ভারতীয়ত্ব বোঝাতে Bollywood-এর চিত্র তারকাদের নাম করে আবোল-তাবোল বকতে শুরু করলাম। হয় তাতেই কাজ হোল, নতুবা আমাকে ওঁদের এক বধ্য-উন্মাদ বোলে মনে হোল; আমার ওপর ওঁদের সন্দেহটাই বোধহয় চলে গেলো। আমার আর underwear খোলার দরকার হোল না! পাসপোর্টটা ফেরত দিয়ে পিঠে একটা চাপড় মেরে এক বন্দুকধারী বলল জামা প্যান্ট পরে নিতে। চটপট তাই করলাম। তারপর ওঁরা আমার ড্রাইভারের সাথে কি যেন একটা মিটিং করল, আমার সামনেই। ড্রাইভার গাড়িতে ঢুকে, সাথে যে map নিয়ে গেছিলাম, তার ওপর আঙুল দিয়ে দিয়ে আমাকে বোঝাল যে আমারা যে রাস্তা দিয়ে আগের দিন এসেছিলাম, তা বন্ধ হোয়ে গেছে, অন্য ঘুর-পথে ফিরতে হবে। শুধু তাই নয়, আমরা যাতে ওঁদের সাথে কোনরকম ছলা-কলা করে অন্য কোন রাস্তায় চলে না যাই, তার জন্য ওঁরা ওদের লোক পাঠাচ্ছে একটা জীপে, ওঁরা সামনে সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, আমরা শুধু সেই পথেই ওঁদের follow করে করে যেতে পারবো, নচেৎ নয়। আর বেশী ব্যাগোড়বাই করলেই, ঢিসুম! সব কিছুতেই রাজি হলাম। কিন্তু তাতেও রক্ষা নেই। একজন এসে বলল যে আমার camera-টা এখানে রেখে যেতে হবে। সে কি? তা কি করে সম্ভব? আমার যে মিশরের অনেক জায়গাই ঘোরা বাকী এখনো! ক্যামেরা ছাড়া চলবে কি করে? আমার এতো সাধের মাউন্ট সিনাইয়ের সূর্যোদয়ের ছবিগুলোও তো এরই ভেতর! কাকুতি মিনতি করলাম। কোন লাভ হোল না। ওঁদের কথা হোল যে ওঁরা চায় না যে আমি এখানকার রাস্তা-ঘাট, চেকপোস্ট, এসবের ছবি তুলি বা সেইসব ছবি এখানকার বাইরে যাক। আমি বললাম ঠিক আছে, তাই সই। কথা দিলাম যে আমি এই তল্লাটের আর কোন ছবি তুলব না, আর already তোলা ছবিগুলোর মধ্যে ওঁদের যেগুলো পছন্দ নয়, সেগুলো delete করে দিচ্ছি। ওঁরা বলল ঐ যে সামনে জীপে আমাদের লোক তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে, ওঁরা কি তোমার মামা? যে তোমায় ছবি delete করতে সময় দেবে? আমার দেওয়া কথার ভিত্তিতে যদিও বা camera-টাতে ছাড় দেওয়া যায়, ওর ভেতরের ছবি সমেত card-টা কিছুতেই ওঁরা এখান থেকে বেরতে দেবে না। কি করবো? ঐ card-টাতেই রফা করলাম, SD memory card-টা বার করে ওঁদের দিয়ে দিলাম। যে সূর্যোদয়ের বর্ণনা দেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়; সেই সূর্যোদয়ের ছবিগুলো সমেত, সেই সূর্যোদয়ের একটা video সমেত! বুকটা ফেটে গেলো। তারপরও রেহাই নেই। ওঁরা জিগ্যেস করলো যে সাথে আর কটা card আছে? সেখানে এখানকার রাস্তাঘাট বা চেকপোস্টের ছবি তোলা আছে কিনা, ইত্যাদি। মোদ্দা কথা যা বুঝলাম তা হোল এই যে,

ভালয় ভালয় ওঁরা শুধু আমার প্রাণটা নিয়েই এখান থেকে আমায় ফেরত যেতে দেবে, অন্য কিছু নিয়ে নয়। বাকি card-গুলোও দেখালাম, ওঁরা বুঝল যে ওগুলো empty।

তারপর শুরু হল সামনের ঐ জীপটাকে follow করা। প্রাণে ভয়, কিন্তু চারিপাশের দৃশ্য দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সিনাই-পেনিনসুলার সে কি অপরূপ রূপ, যা দেখে কিনা একটা প্রাণ-ভয়ে ভীত মানুষও মুগ্ধ হোয়ে যেতে পারে। অবাক চোখে চারিদিক দেখছিলাম। বিভিন্ন চেকপোস্টের ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছিলো। মাঝে একবার মনে হোল যে আদৌ ঠিকঠাক যাচ্ছি তো? নাকি এই সবই আমাকে ভাঙ্গিয়ে কিছু ডলার কামাবার ষড়যন্ত্র? কে জানে, আমাকে হয়তো এঁরা কোন 'মাল'-দার পার্টি ঠাউরেছে! আর আমি 'মাল'-দার না হোলেই বা কি? আমেরিকা-তো বটে! একটা দম বন্ধ করা ভয় চেপে বসতে শুরু করলো বুকে। একটা মতলব এলো মাথায়। আমার যদি কিছু একটা হয়ে যায়, তাহলে একটা কিছু অন্তত রেখে যাই আমার মেয়েগুলোর জন্য, যাতে ওদের জানার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকে যে ওদের বাবা কোথায় বেঘোরে প্রাণটা দিয়েছে। যেই ভাবা, অমনি কাজ। Camera-য় একটা card ভোরে তাতে আমার একটা ছবি তুললাম, একটা মোক্ষম selfie! সাথে আমার ড্রাইভারেরও একটা ছবি। একটা ভিডিও রেকর্ড করলাম, কি অবস্থার মধ্যে পড়েছি তার একটা ছোট বর্ণনা দিয়ে। তারপর সেই card-টা camera থেকে বার করে পাক মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম গাড়ির বাইরে। ভালো কেউ যদি এটা কুড়িয়ে পায়, এই আশায়! হটাত সামনের জীপটা দাঁড়িয়ে পড়লো, সেই অনুযায়ী আমরাও। আর ঠিক তখনই আমার খেয়াল হোল যে আমি এই মাত্র ওদেরকে দেওয়া কথার খেলাপ করেছি, এই তল্লাটে আর কোনও ছবি তুলবো না বলার পরও আবার ছবি তুলেছি। আমার আত্মারাম খাঁচা। ভাবলাম এই রে, ওরা নিশ্চয়ই দূরবীন দিয়ে আমার ছবি তোলা বা কিছু একটা ছুঁড়ে ফেলার কীর্তি-কলাপ দেখেছে; এবার তার জবাব চাইবে। আমি কি জবাবদিহি করবো? এখন কি করি? জীপ থেকে দুজন বন্দুকধারী নেমে পেছনে আমাদের গাড়িটার দিকে আসতে লাগলো। আমি শুধু আমার heart beat টাই শুনতে পারছিলাম। ওঁরা এসে বলল যে আমরা একটা junction-এ এসে পড়েছি। ওরা আর আমাদের পথ দেখাবে না। আমরা ডান দিকের রাস্তা ধরলে ঘুর পথে সুয়েজ হোয়ে কায়রো পৌঁছে যাব। আর কোনরকম বেয়াদবি করে বাঁ দিকে যাবার পাঁয়তারা কোসলেই, ঢিসুম! ওরা ওদের জীপে ফেরত গেলো, কিন্তু ঠায় বসে থাকলো আমরা কোন রাস্তা ধরি, তা দেখার জন্য। আমরা ডান দিকের রাস্তা ধরে মানে মানে কেটে পড়লাম। আমার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানিটা আমাদের গাড়ির ইঞ্জিনটার থেকেও বেশী জোরে ছুটছিল,আরও বেশী জোরে শব্দ করে যেন। বেশ কিছুক্ষণ ঐ ভাবে যাবার পর, কায়রোর দিকে যাবার একটা road-sign চোখে পড়লো। ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলাম, আবার। তারপরই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে শুরু করতে পারলাম যে এ যাত্রায় বোধহয় আর প্রাণের ভয় নেই! খানিক্ষন পরে খেয়াল হোল যে আমার গায়ের জামাটা ভিজে চুবুর, সপ্ সপ্ করছে ঘামে! তারই সাথে একটা অনুভূতি হোল; ঐ ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার পর যেমন হয়, অনেকটা সেইরকম। ***:এই প্রতিবেদনের বর্ণিত ঘটনা ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের:***

ভেগোলজি : শিল্প-সাহিত্যের ভবিষ্যত

অনাবিল সিদ্ধান্ত

‘ভেগোলজি’ শব্দটির সাথে বাংলার সাহিত্যিক , সাহিত্য-সমালোচক, রস-সমীক্ষকদের তেমন পরিচয় নেই। এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ কেন যে সাহিত্য-রসিকদের অগোচরে আছে তা বিস্ময়কর। তাতে অবশ্য ভেগোলজির বিকাশের পথে কোন বাধা হয়নি, কেননা আধুনিক কালের কবি-সাহিত্যিক এবং চিত্রকরেরা তাঁদের নিজেদের অজান্তেই শিল্প-সাহিত্যে ভেগোলজির বিকাশের পথে তাঁদের উদ্ভ্রান্ত অবদান রেখে চলেছেন। ভেগোলজিই যে শিল্পসাহিত্যের ভবিষ্যত একথা রবীন্দ্রনাথও উপলব্ধি করেছিলেন। কেবল তাই নয়, তার আগমনের পথ প্রশস্ততর করার প্রয়াসে তিনি তাঁর সৃজনশীলতাকে সচেতনভাবে অবচেতন জগতের গভীরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ইংরাজিতে ভেগ (vague) শব্দটির অর্থ ‘অনির্দিষ্ট, ভাসা-ভাসা’।আর ভেগারি (vagary) শব্দটির অর্থ ‘খামখেয়ালি ভাবনা’। ব্যুৎপত্তির বিচারে এই দুটি শব্দই এসেছে ল্যাটিন ভেগাস (vagus) শব্দ থেকে। এই শব্দটির অর্থ ‘সঞ্চরণশীল’। যারা উদ্দেশ্যহীনভাবে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায় , যাদের কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই তাদের আমরা বলি ভেগাবন্ড, আর যাদের কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই ব্যঙ্গার্থে যাদের চৈতন্য অনিকেত, তাদের বলি ‘ভেগ্রান্ট’। শিল্পসাহিত্যের জগতে যারা ভেগাবন্ডের মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণ করে , ভ্যাগ্রান্টের মতো যারা অনিকেত এবং উৎকেন্দ্রিক তাদের বোধকরি ‘ভেগোলজিস্ট’ বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই অনুমান করেছিলেন যে , ভাবী কালের শিল্পসাহিত্য কার্যত ভেগোলজির অন্যতম শাখায় পরিণত হবে। তাই তিনি তাঁর মনের চেতন স্তরকে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে পাঠিয়ে অবচেতনার গহন থেকে শব্দচয়ন করে কাব্যরচনা করে ভাবী কালের কবিতার নমুনা পেশ করে গেছেন। তাঁর রচিত ‘অবচেতনার অবদান’ শীর্ষক রচনার মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন :

অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ করে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারি এই নমুনা। কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তা’ হলেই আশাজনক হবে।

গলদা চিংড়ি , তিংড়ি মিংড়ি

লম্বা দাঁড়ার করতাল।

পাকড়াশিদের কাঁকড়া ডোবায়,

মাকড়শাদের হরতাল।

* * * * * * *

কলেজ পাড়ায় শেয়াল তাড়ায়

অন্ধ কলুর গিন্নি।

ফটকে ছোঁড়া চটকিয়ে খায়

সত্যিপিরের সিন্নি।

* * * * * * *

গরাণহাটায় সজনেডাঁটা

কিনছে পুলিস সার্জন।

চিৎপুরে ঐ নাগা সন্ন্যাসী

কাৎ হয়ে মরে চারজন।

* * * * * * *

একথা বললে সত্যের অপলাপ হয় না যে, আধুনিক কবিতা এবং চিত্রকলা ভেগোলজিরই দুই শাখা। ভাষান্তরে বলা যায়, আধুনিক যুগের কবি এবং চিত্রকরেরা ভেগোলজিস্ট নামে

অভিহিত হতে পারেন, কেননা তাদের নান্দনিক প্রয়াসে ভেগোলজির সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকটভাবে উপস্থিত। প্রাতঃভ্রমণে বেরোলে যেমন কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য থাকেনা,কবিদের কবিতা লেখাটাও অনেকটাই তাই। সেখানে শব্দ চয়ন আছে, অর্থবহ হয়ে ওঠার দায় নেই। সেখানে বাক্য আছে কিন্তু বক্তব্য নেই, কথা আছে কিন্তু তাৎপর্য নেই, ভাব যা আছে তা ভাবায় না মোটে। ভাষার একটি উদ্দ্যেশ্য মনের ভাব প্রকাশ করা , আর একটি উদ্দ্যেশ্য বোধকরি মনের ভাব গোপন করা।

আধুনিক যুগের কবিতা কি কিছু বলে? নাকি বলার ভান করে? প্রতিটি শব্দেরই একটি অভিধানগত অর্থ আছে, কিন্তু কবিতায় তারা সে-অর্থে ব্যবহৃত হয়না। ইংরেজ কবি টি . এস . এলিয়ট বলেছেন, 'চোর যেমন মাংসের টুকরো দিয়ে প্রহরী-কুকুরকে ভুলিয়ে রাখে কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের আভিধানিক অর্থ তেমনি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে প্রকৃত তাৎপর্য বোঝার ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলে'।

বিগত সত্তরের দশকে রচিত একটি কবিতার কয়েকটি লাইন নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে :

জীবন্ত ফুলের ঘ্রাণে

দুপুরের মিহি স্বপ্ন হয়েছে চৌচির।

তুমি কি এখনও জেগে ?

রজনীগন্ধার আড়ালে সোনালি ঢেউ –

নির্জন গ্রীবার মতো স্তব্ধতায়

খুঁজে ফিরি শব্দের মিছিলে।

আমি জানি, আগুনের নীল শিখার মতো

আকাশ রাগে রী-রী করে।

রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে

ভস্মলোচন।

উদ্ধৃত লাইনগুলিতে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের আভিধানিক অর্থ আমাদের জানা। কিন্তু এই অর্থবহ শব্দগুলি মিলে যে অর্থহীন কোলাজ তৈরি হয়েছে তাকে ভেগোলজির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। প্রথম দুটি লাইনের কথাই ধরুন :

'জীবন্ত ফুলের ঘ্রাণে / দুপুরের মিহি স্বপ্ন হয়েছে চৌচির'।

জীবন্ত ফুলের ঘ্রাণ সম্পর্কে আমি যতটা জানি তাতে এই ঘ্রাণে কারও নিদ্রাভঙ্গ কিংবা স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার কথা নয়। অথচ এই গন্ধে কবির দুপুরের মিহি স্বপ্ন ভেঙে চৌচির হয়েছে। এ কেমন ঘুম ? কবি কি এখানে দুপুরের অগভীর ভাতঘুমের হাল্কা স্বপ্নের কথা বলতে চেয়েছেন যে স্বপ্নচেতনায় ফুলের সৌরভও এলার্ম ক্লক !এর পরের লাইনেই কবির প্রশ্ন , 'তুমি কি এখনও জেগে?' জীবন্ত ফুলের সশব্দ গন্ধে মিহি স্বপ্ন ভেঙে খান-খান হয়ে গেল, অথচ নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে কিনা সে-সম্পর্কে কবির মনে এখনও সংশয় !

পরের লাইনটি চমকপ্রদ ।'রজনীগন্ধার আড়ালে সোনালি ঢেউ –' । যে ফুলের গন্ধে স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়েছে সে ফুল কি তবে রজনীগন্ধা ? যে সোনালি ঢেউ-এর কথা কবি বলেছেন সেকি কোনো স্বর্ণকুন্তলার স্মৃতির তরঙ্গ ? নাকি কবির কোনো সোনালি নস্টেলজিয়া ? এর পর কবি 'নির্জন গ্রীবার মতো স্তব্ধতায় ' 'শব্দের মিছিলে' কিছু একটা খুঁজছেন। কী খুঁজছেন কবি ? কাকে খুঁজছেন ? 'নির্জন গ্রীবার মতো স্তব্ধতায়'- আলোচ্য কবিতার এই পংক্তিটি মনে করিয়ে দেয় কবি জীবনানন্দ দাশের একটি লাইন যেখানে তিনি 'উটের গ্রীবার মতো কোন এক নিস্তব্ধতা'-র কথা বলেছেন। বর্তমান কবিতার গ্রীবাটি কার-- কবি সে- সম্পর্কে কিছু বলেন নি। এ গ্রীবা কি উটের নাকি জিরাফের ? নাকি কোনো নীরার কিংবা স্বাতীর ? কবি ছাড়া আর কে সে-কথা জানবেন ? কিংবা বোধকরি কবিও তা জানেন না, কেননা তিনি হয়তো গ্রীবার মালিকের গ্রীবা অংশটুকুই দেখেছেন।

কবিতাটির সমাপ্তিসূচক অংশে কবি বলেছেন 'আমি জানি, আগুনের নীল শিখার মতো / আকাশ রাগে রী-রী করে।' আগুনের শিখা কখন নীল হয় তা বিশদভাবে জানেন রসায়নবিদেরা। তাই, এ লাইনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা আমার সাধ্যের বাইরে। তবে পাঠকেরা যে এই কবিতার অর্থভেদে অসমর্থ হয়ে রাগে রী রী করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনও হতে পারে, পাঠক তার কবিতার অর্থ উদ্ধার করতে অপারগ এটা বুঝেই কবি রাগে রী রী করছেন। কবিতার শেষে ভস্মলোচনের প্রসঙ্গ সে-সন্দেহকেই

আরও জোরদার করে। কবি কি আমাদের মতো অপরিশীলিত পাঠকদের ভস্ম করে দেবেন বলে রক্তের দর্পণে মুখ দেখছেন?

আধুনিক কালের একটি মাত্র কবিতা কে নমুনা হিসাবে বেছে নিয়েছিলাম। পাঠকেরা ঐচ্ছিকভাবে একালের যে-কোনো কবিতা বেছে নিয়ে তার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করলেই বুঝবেন যে এযুগে কবিতা লেখাটা ভেগোলজির চর্চা ছাড়া কিছু নয়।

কেবল আধুনিক যুগের কবিরাই নয়, আধুনিক যুগের চিত্রকরেরাও সমভাবে ভেগোলজিস্ট। পিকাসোর আঁকা ছবির কথাই ধরা যাক। পরিণত পিকাসো যে-সব ছবি আঁকতেন সে-সব ছবি শিশুর আঁকা ছবির মতো স্বয়ং পিকাসো ভাষান্তরে একথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, ' It took me four years to paint like Raphael, but lifetime to paint like a child.' অর্থাৎ, রাফাইলের মতো আঁকা শিখতে আমার চার বছর লেগেছে, কিন্তু শিশুর মতো আঁকা শিখতে আমার সারাজীবন লেগে গেছে।

পিকাসোর ছবির অর্থ বোঝা যায় না একথা পিকাসোকেও বহুবার শুনতে হয়েছে। এ ব্যাপারে পিকাসোর কৈফিয়ৎ : ' The world today does not make sense ; so why should I paint pictures that do ?'

পিকাসোর একটি বিখ্যাত ছবি সম্পর্কে একটি মজার গল্প শুনেছিলাম প্যারিসবাসী চিত্রসমালোচক শ্রী সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে।

এক ধনী মহিলা এসেছেন পিকাসোর স্টুডিওতে। ওই মহিলা শুনেছেন পিকাসো একজন বিখ্যাত চিত্রকর এবং তাঁরআঁকা ছবি সংগ্রহ করে ড্রয়িং রুমে রাখলে সেটা হবে তার পরিবারের স্ট্যাটাস সিম্বল। মহিলাটি যখন স্টুডিওতে এসেছিলেন তখন পিকাসো একটি ক্যানভাসের ওপর তুলি বোলাচ্ছিলেন। ওই মহিলা ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সেখানে একটি অদ্ভুত ছবি আঁকা আছে।

মহিলাটি চিত্রকরকে জিজ্ঞেস করলেন , 'মঁসিয়ে আপনি এই ক্যানভ্যাসে কী এঁকেছেন?'

পিকাসো উত্তর দিলেন, ' A man with a mandolin' ।

মহিলাটি কিছুক্ষণ ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে আতিপাতি করে খুঁজলেন,কিন্তু কোনো মানুষই তাতে দেখতে পেলেন না, কোনো ম্যান্ডলিনও না।

হতাশ হয়ে ওই মহিলা পিকাসোকে বললেন, 'কিন্তু আমি তো ক্যানভাসে কোনো মানুষ বা ম্যান্ডলিন দেখতে পাচ্ছি না।'

পিকাসো বললেন , 'আপনি কি চিনাভাষা জানেন ?'

মহিলাটি বললেন, 'না '।

--'তার মানে চিনা অক্ষরে কিছু লিখলে সেটা আপনার কাছে হিজিবিজি মনে হবে। '

হিজিবিজির কোনো উল্টো-সোজা নেই, লেজা-মুড়ো নেই । আধুনিক ছবির ক্ষেত্রেও উল্টো-সোজা থাকাটা জরুরি নয়। প্রসঙ্গত একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায় ।

বিখ্যাত ফরাসি চিত্রকর আঁরি মাতিস-এর বিমূর্ত চিত্রকলার প্রদর্শনী চলছিল নিউইয়র্ক শহরে । শহরের একটি বিখ্যাত আর্ট গ্যালারীতে মাতিসের আঁকা বেশ কিছু ক্যানভাস প্রদর্শিত হয়েছিল। ছবিগুলিকে দেয়ালে টাঙানোর সময় অসতর্কতাবশত একটি ক্যানভাস উল্টোভাবে রাখা হয়েছিল। কিন্তু আঁরি মাতিসের বিমূর্ত শিল্প উল্টানো অবস্থাতেও বোধকরি সমান বিমূর্ত ! কাজেই শিল্প-প্রদর্শনির উদ্যোক্তাদের এবং শিল্পবোধ্যাদের চোখে এ ত্রুটি চোখে ধরা পড়লো না। বহু শিল্প-রসিক এবং ললিত-কলা সমালোচক ওই চিত্রপ্রদর্শনী দেখলেন এবং মাতিসের শিল্প-প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। কয়েকটি ছবি দর্শকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ওই ছবিগুলির মধ্যেই একটি উল্টোভাবে টাঙান হয়েছিল।

তিন সপ্তাহ ধরে ওই চিত্র-প্রদর্শনী চলছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোনো দর্শক বা চিত্রসমালোচকই ছবিটিতে কোনো অসঙ্গতি লক্ষ করেননি। ছবিটা যে উল্টোভাবে টাঙান হয়েছে সেটা ধরা পড়ল প্রদর্শনীর শেষ দিন। এগার বছরের একটি ছেলে তার শিক্ষিকাকে বলেছিল , ' ম্যাডাম, দেখুন ছবিটা উল্টো করে টাঙান হয়েছে '।

শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন ছেলেটির কথা শুনতে পেলেন। ছবিটা খুঁটিয়ে দেখে এবার তিনিও বুঝলেন ছেলেটি ঠিকই বলেছে । ক্যানভাসটা উল্টো ভাবেই ঝোলান হয়েছে। গ্যালারীতে হৈ চৈ পড়ে গেল। তিন সপ্তাহ ধরে এত বড়ো বড়ো শিল্পরসিক,শিল্প-বোধ্যা ছবিগুলি দেখলেন,তবু তারা ছবিটির এ অসঙ্গতি ধরতে পারলেন না, অথচ একটি ছোট স্কুল-ছাত্র সেটা ধরে ফেলল।

প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল ,'আচ্ছা, তুমি বুঝলে কেমন করে যে,ছবিটা উল্টোভাবে রাখা হয়েছে?'

ছেলেটি বললো, 'সবগুলি ছবির নিচে চিত্রকরের স্বাক্ষর আছে। এই ছবিটায় চিত্রকরের স্বাক্ষর খুঁজতে গিয়ে দেখলাম সেটা আছে ছবির ওপরের দিকে।'

গল্পটা শুনিয়েছিলাম আমার কবি-বন্ধু কমল দে শিকদারকে। তিনি গল্পটি শুনে বললেন, 'বাঃ, আধুনিক ছবির সাথে আধুনিক কবিতার দেখছি আশ্চর্য মিল ! আধুনিক কবিতারও উল্টো-সোজা নেই। কবিতার প্রথম লাইন থেকে পড়তে শুরু করে নিচের দিকে নেমে যেমন শেষ লাইনে যাওয়া যায়,তেমনি শেষ লাইন থেকে শুরু করে ওপর দিকে উঠে প্রথম লাইনে আসা যায়। এতে কবিতার অর্থের কোনো হেরফের হয় না। '

কমলদা বোধকরি বলতে চেয়েছিলেন , 'এতে কবিতার অর্থহীনতার কোনো হেরফের হয় না' ।

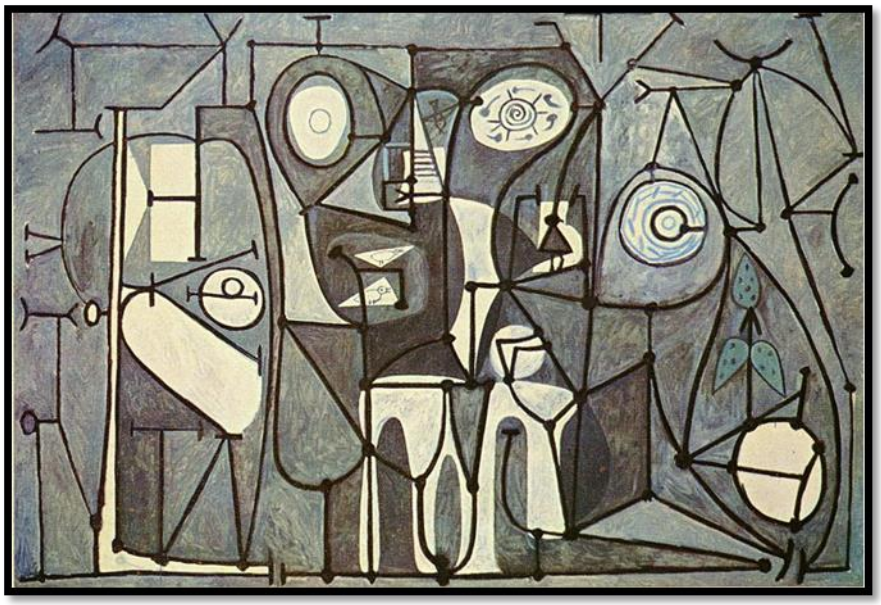

আমার ভূস্বর্গ দর্শন

নীলিমা চক্রবর্তী

এ লেখা কোনো গল্প নয়, কবিতা নয় – এ এক ছোট্ট ভ্রমণ কাহিনী। আমি কলকাতায় থাকি। আমার কাছে আমার ছেলের অনুরোধ – "মা আমাদের এখানকার পুজা পত্রিকায় একটা লেখা দেবে"? ছেলে আমায় বিপদে ফেলেছে। সুদূর আমেরিকার বিংহ্যামটনের দুর্গাপুজা। শুনেছি বিদেশে সব বাঙালি এবং অন্যান্য সব ভারতীয়রা মিলে এক এক জায়গায় পুজা করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। সবাই পরমাত্মীয় হয়ে মিলে মিশে আয়োজন করে, আনন্দ করে। তখন মনে হয় আমাদের এই দুর্গাপুজা মানুষে মানুষের এক মেলবন্ধন। আমরা বলি শারদীয়া পুজা এক সামাজিক উৎসব। বিভিন্ন ধর্ম নির্বিশেষে সব ধর্মের মানুষ আমাদের কলকাতায় আনন্দ করে। সারা বছর সব মানুষ এই পুজার দিকে তাকিয়ে থাকে। কেউ তাদের সৃষ্টি দেখানোর জন্য, কেউ বা আবার সৃষ্টি দেখবার জন্য। সৃষ্টি বলতে প্রতিমা তৈরি, প্যান্ডেলে কারুকার্য, প্রতিমা সাজানো, এই সব। তারপর আছে মেলা – শারদ মেলা। কেউ সারা বছরের রুজিরোজগারের চেষ্টা করে এই সময়। কেউ বেড়াতে যায়। সবাই সবাই কে উপহার দেয় – সে যাই হোক।

আমি এই পুজাতেই গত বছর আমার মেয়ে কে নিয়ে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলাম। কাশ্মীর বেড়াতে যাওয়ার পথে আমরা মা বৈষ্ণোদেবীকে দর্শন করেছিলাম। মা বৈষ্ণোদেবী হলেন তিন দেবীর সমন্বয় - মহালক্ষ্মী, মহাকালী, মহাসরস্বতী। দেবী মূর্তি বলে কিছু নেই। তিনটি ত্রিভুজাকৃতি পাথরের পিণ্ড, সোনার মুকুট পরানো। প্রথমে আমরা জম্মু গেলাম। সেখান থেকে গাড়িতে

কাটরা। কাটরাতে থেকে তারপর আমরা বৈষ্ণো মা কে দেখতে গেলাম। পাহাড়ি রাস্তায় ১৪ কিলোমিটার উঠে পাহাড়ের মাথায় মন্দির। পথ অতি সুন্দর। মাকে দর্শন করে মন ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে গেল। কাটরা থেকে এরপর গেলাম শ্রীনগর। কাশ্মীরের প্রধান শহর। সুন্দর, সাজানো গোছানো। শ্রীনগরে বিখ্যাত ডাল লেক শহরের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে। লেকে হাউসবোটগুলো যেন এক একটা স্টার হোটেল। হোটেলের সব আয়োজনই তাতে রয়েছে। রাত্রিতে কি সুন্দর আলোকসজ্জা। লেকে বড় বড় দোকান, বেশ বড় মার্কেট জলের উপর। কাশ্মীরের বিখ্যাত কাজের বস্ত্র-সম্ভারের দোকান। শ্রীনগরে মোগল গার্ডেন, শোনমার্গ, গুলমার্গ, পাহাড়ের মাথায় শঙ্করাচার্যের মন্দির – এসব মুগ্ধ হয়ে দেখলাম।

গুলমার্গে গিয়ে পাহাড়ের মাথায় রোপওয়ে চরলাম। সেখানে দেখলাম ভারত পাকিস্তান বর্ডার। ঝুর ঝুর করে তুষার বৃষ্টি

পড়ল গায়ে মাথায়। ওয়াঘা বর্ডার। মাঝখানে রাস্তা। একধারে গ্যালারী করা। সৈন্যদের মার্চ পাস দেখার জন্য। রাস্তার দুদিকে দুই গেট, এক দিকে ভারতের, একদিকে পাকিস্তানের। দুই গেটের মাথায় দুই দেশের অতন্দ্র প্রহরী। বিকাল পাঁচটায় দুই দেশের মাঝখানের গেট খুলে যায়। দুই দেশের সৈন্যরা পরস্পরের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ করমর্দন করে। দুই দিকে মার্চ পাস হয়। তারপর আবার গেট বন্ধ হয়ে যায়।

এত সব কিছু দেখার পরেও কাশ্মীরকে কেন ভূস্বর্গ বলে তা কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। পহেলগাঁও গিয়ে উপলব্ধি করলাম কাশ্মীরের নৈসর্গিক সৌন্দর্য। চারিদিকে বিশাল পর্বত আর পাইন গাছ দিয়ে ঘেরা এই জায়গার সৌন্দর্য অসাধারণ। যাওয়ার পথে পাটনিটপ শহরটিও দেখলাম, খুব সুন্দর। মনে হয় পহেলগাঁওকে ঈশ্বর স্বর্গের সৌন্দর্যে সাজিয়ে দিয়েছেন। এই পহেলগাঁওয়ের ওপর দিয়ে যে পথ চন্দনবাড়ি পর্যন্ত গেছে তা অমরনাথ যাওয়ার পথ। চন্দনবাড়ি পৌঁছে দেখলাম পাহাড়ি ঝর্ণা। পাহাড়ি মেঠো পথ কেটে কেটে সিঁড়ি তৈরী হয়েছে। তীর্থযাত্রীরা চন্দনবাড়িতে ঝর্ণায় স্নান করে অমরনাথ যাত্রা করেন। কেউ তিন দিন ধরে হেঁটে, মাঝে মাঝে চটিতে বিশ্রাম নিয়ে, কেউ ডুলিতে, কেউ ঘোড়ায় বাবা শিবকে দর্শন করতে যান। আজকাল আবার হেলিকপ্টারেও যাওয়া যায়। অমরনাথ ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষের কাছে এক বিস্ময়। পাহাড়ের অন্দরের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ফোঁটা ফোঁটা জল জমে বেশ খানিকটা উঁচু বরফের স্তূপের মতো হয়। দেখলে শিবলিঙ্গ বলে মনে হয়। এই বরফ শিবলিঙ্গই বাবা অমরনাথ। এই শিবলিঙ্গকেই লোকে পুজা করেন।

আমার ভাগ্যে অবশ্য অমরনাথ দর্শন এ যাত্রা হলো না। আমরা পহেলগাঁওয়ের হোটেলে ফিরে এলাম। পহেলগাঁওতে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক বেশি। অনেক আপেল বাগান দেখলাম। গাছে ভর্তি আপেল। ফেরার পথে অসাধারণ সব নৈসর্গিক দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা অমৃতসর এলাম। এখানে গুরু গোবিন্দজীর স্বর্ণমন্দির রাত্রিবেলা দেখার মতো। মন্দিরের চুড়ো, মিনার, সবই সোনার। রাত্রিতে আলো পড়ে তা ঝকঝক করে। মন্দিরের পাশের লেকের জলে মন্দিরের ছবি দেখবার মতো। স্বর্ণমন্দির সত্যিই দেখবার মতো। স্বর্ণমন্দিরে যে সব ভক্ত পুজো দিতে আসেন তাঁরাও অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। সবাই চুপচাপ লাইন করে মন্দিরে ঢুকছেন। সত্যিই শিক্ষণীয় এদের কর্মনিষ্ঠা এবং শৃঙ্খলাপরায়ণতা।

এরপর ফেরার পালা। অমৃতসর থেকে হাওড়া। সঙ্গে মন ভরে বেরানোর স্মৃতি নিয়ে ফিরলাম। এর কিছুটা পাঠকদের সামনে প্রকাশ করার চেষ্টা করলাম। লেখার শেষে সবার জন্য রইল আমার শারদীয়ার শুভেচ্ছা।

বিশ্বাস-অবিশ্বাস

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি

আমাদের এই ঘটনা বহুল জীবনে রোজ কত কিছুই তো ঘটে , আবার আমরা কত শীঘ্রই সেসব ঘটনা ভুলে যাই ।তবে মাঝে মাঝে এমন ঘটনাও ঘটে আমরা যা সারাজীবনেও ভুলতে পারিনা। আজ সেই রকমই একটি ঘটনার গল্প লিখছি।

এই গল্পের প্রথম ঘটনাটার আরম্ভটা হয়েছিল খুবই সাধারণ ভাবে। আমরা তিন বন্ধু মিলে ফিরছিলাম খড়গপুর থেকে কোলকাতা, কোল-ফিল্ড এক্সপ্রেস ট্রেনে করে। এটা অনেক বছর আগের কথা তখন আমি সবে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছি। আমরা বন্ধুরা খড়গপুর আই আই টিতে গিয়েছিলাম প্রথম তৈরি কম্পিউটার দেখতে, খুব সম্ভব সময়টা ছিল পুজোর ছুটি। আমরা সকলেই বেশ ভাল ছাত্র ছিলাম আর তার জন্য আমাদের মনে খানিক গর্বও ছিল, আমিতো নিজেকে সকলের থেকে খানিক আলাদা হিসেবেই ভাবতাম। তখন আমাদের বয়সটাই ছিল নিজেদের স্পেশাল ভেবে আনন্দ পাবার।

সেদিন ট্রেনে উঠে দেখলাম বেশ ভিড়, তাই একসঙ্গে তিনজন আমরা বসতে পারলাম না। ছিটিয়ে ছড়িয়ে বসতে হোল। ট্রেন প্রায় ছেড়ে দিচ্ছে এমন সময়ে চোখে পড়ল যে তাড়াহুড়ো করে আমাদের কামরাতে এসে উঠল একলা একটি মেয়ে। তখনকার দিনকাল ছিল খানিকটা অন্যরকমের, কলকাতা শহরে বাসে ট্রামে ও রাস্তায় মেয়েরা একা চলাফেরা করলেও ট্যাক্সি বা ট্রেনে সাধারণত সম্পূর্ণ একা একটি মেয়েকে খুব একটা দেখা যেত না। তাই তখন একটু অবাক লেগেছিল। আমাদের ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে ছিল অনেকগুলি সারি সারি সিট, মেয়েটি এসে বসলো ঠিক আমার সামনের রো তে , একটা খালি সিট ছিল সেখানে। আমার দুই বন্ধু মনে হোল দুর থেকে এদিকে তাকিয়ে দেখছে, ওদের একটু দুরেই বসতে হয়েছিল তো। ট্রেন চলতে থাকল এবার , ট্রেনের দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বোধহয় আর দেখছিলাম কম্পিউটারের স্বপ্ন, , তখন তো মনে ছিল অনেক উচ্চাশা আর বড় হবার আকাঙ্ক্ষা।

আমার তন্দ্রা টুটে গিয়েছিল কার যেন কথার শব্দে, ঘুম ভরা চোখ মেলে দেখি, সেই মেয়েটি আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে কি যেন বলছে, তখনকার যুগে আমার মত ভাল ছেলেরা চট করে অচেনা মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করত না। তবে মেয়েটির সরলতা মাখান চাউনি আর আন্তরিক গলার স্বর শুনে দোটানায় পড়ে গেলাম, অভদ্রতা তো করা যায়না। মেয়েটি এদিকে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই অনেক কথা বলে গেল। যার সারাংশ শুনে দ্বিধায় পড়েছিলাম। মেয়েটির নাম বুলু। বুলু আমার আর আমার বন্ধুদের কাছে কিছু সাহায্য চায় কারণ ও নাকি একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে গেছে। বুলুর বাবা পুলিশের এক মস্ত অফিসার, তাঁর বদলির চাকরি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে। বুলুর মা নেই ছোট থেকে, বুলু তাই তার মামাবাড়ি হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে থেকে বড় হয়েছিল। মামাদের এক্সপোর্টের বিরাট ব্যবসা, আর্থিক অবস্থা সচ্ছলের চেয়েও অনেক বেশি। বুলু এমনিতে বেশ ভালই ছিল, লোরেটো কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স নিয়ে পড়ছিল। বুলুর মতে তার জীবনে হঠাৎ ঘনিয়ে এসেছে এক বিরাট সমস্যা এইজন্য যে বুলু র মতামত না নিয়েই বুলুর বাবা ওর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন বুলুর সম্পূর্ণ অজানা এক বয়স্ক পাত্রের সঙ্গে। বুলু অবশ্যই এখনই এভাবে বিয়ে করতে রাজি নয়। এদিকে এই বিয়েতে বুলুর মামাদেরও মত আছে , বুলু তাই নিরুপায় হয়ে চলে গিয়েছিল তার পিসির বাড়িতে খড়গপুরে, কিন্তু তিনিও অন্যদের মতেই বিশ্বাসী হয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেছেন বুলুকে বাড়ি ফেরবার জন্য। এখন বুলুর বাড়ি থেকে মামারা আসবে স্টেশনে ওকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বুলু বাড়ি ফিরতে চায়না কোনমতেই, সে আমাদের সাহায্য নিয়ে ট্যাক্সি করে তার এক বান্ধবীর বাড়ি ব্যারাকপুর চলে যেতে চায় বাড়ির লোকদের এড়িয়ে। আমরা কি তাকে সাহায্য করব? খানিকক্ষণের জন্য ভেবে পাইনি আমাদের আমরা কি করা উচিত। আমরা তিনজনেই ছিলাম রক্ষণশীল পরিবারের ছেলে, তখনকার দিনের সামাজিক নিয়মকানুন সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তবুও এই সাহায্যের ব্যাপারটাকে আমাদের কোনও অন্যায় বলে মনে হয়নি, হয়ত বয়সোচিত উদারতার গুনে, আবার আমাদের

অবচেতন মন খানিক শিভ্যালরি দেখাতে পারবার সুযোগকে ছাড়তে চায় নি। আমরা তাই সহজেই রাজি হয়ে গিয়েছিলাম বুলুর প্রস্তাবে। বাকিটা পথ চারজনে মিলে অনেক পরিকল্পনা চলেছিল কি ভাবে কি করা হবে এই নিয়ে।আমাদের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল । ঠিক হয়েছিল স্টেশনে নামবার পরে আমাদের একজন ট্যাক্সির ব্যবস্থা করতে যাবে আর বাকি দুজন বুলর দুপাশে থাকবে।আমরা কোনোদিকে না তাকিয়ে ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে যাব। তিন বন্ধু পরোপকারের এমন একটা সুযোগ পেয়ে গিয়ে হয়ত খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়ে ছিলাম, এমন সময় দেখি ট্রেনের গতি আস্তে হয়ে যাচ্ছে। বুলু বলেছিল যে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে কারণ ওর মামা বা বাবা খুব সম্ভবত: কামরার ভিতরে উঠে আসবেন ওকে রিসিভ করতে। আমরা বেশ সতর্ক আর সন্ত্রস্ত থাকলাম।

ট্রেন সম্পূর্ণ থামলে যাত্রীরা নামতে থাকলেন, আমরা চারজনেই চারিপাশ দেখে নামলাম তবে কাছাকাছি সন্দেহজনক কারুকে দেখতে পেলাম না। তখন হাওড়া স্টেশনের ভিড় ঠেলে সবাই ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। বুলু বেশ চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল নামবার পর থেকে খুব সম্ভবত: টেনশনে, লক্ষ্য করছিলাম যে ও হাঁটার গতিও বেশ কমিয়ে দিয়েছে, আমরাও ওর সঙ্গে তাল রেখে আস্তে চলবার চেষ্টা করতে লাগলাম। বুলু কিন্তু কেবলই আমাদের থেকে পিছিয়ে পড়তে লাগল, আর শেষে আমাদের ছেড়ে কখন যেন ভিড়ের ভিতরে মিশে গেল বোঝা গেলনা। আমরা অনেকক্ষণ ওকে খুঁজলাম এদিকে ওদিকে, যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছি, দেখতে পেলাম যে বুলু স্টেশনের একপাশে দাঁড়িয়ে কয়েকজন সুসজ্জিত ও সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সঙ্গে হেসে কথা বলছে। আমরা খানিকটা কাছাকাছি এগিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। বুলু কিন্তু আমাদের দেখেও দেখল না, আমাদের না চেনার ভান করে হাসতে হাসতে ওর দলের সঙ্গে লোকারণ্যে মিশে গেল।আমরা তিনজন সেখানে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকার পর যে যার বাড়ির পথে রওনা হলাম।

এই গল্পের শেষ হয়তো এখানেই হলে ভাল হোতো, কিন্তু বাস্তবে কখন যে কি ঘটে আর কেনই বা ঘটে কে জানে ?
অল্প বয়সের ব্যস্ত ছাত্র জীবনে এসব ছোটখাটো ঘটনা বেশিদিন মনেও থাকেনা, আমাদেরও ছিলনা। আমি পোস্টগ্রাজুয়েট শেষ করে আমেরিকাতে পড়বার জন্য যোগাড় করে ফেললাম এক স্কলারশিপ। আমি খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলাম, তবুও বিদেশে আসা বিশেষ করে অতলান্তিক মহাসাগর পার হওয়া তখনকার দিনে সহজ ছিলনা। বিভিন্ন রকমের প্রস্তুতি ছিল; কাগজপত্র তৈরি করা, মানসিক প্রস্তুতি, টাকাপয়সার যোগাড়, গরম জামাকাপড়ের বন্দোবস্ত, আরও কত কিছু। খুবই তাড়াহুড়ো করে কেটে গেল বেশ কয়েকটা মাস , বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ কমে গেল সময়ের অভাবে। এর পরে আনন্দ উত্তেজনা ও অনেক দ্বিধা মনে নিয়ে এসে পড়লাম আমেরিকার উত্তরপূর্বের একটি বড় শহরে সেখানকার এক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি এইচ ডি করবার উদ্দেশে।তখন আমেরিকাতে ভারতীয়রা সংখ্যায় অনেক কম ছিল। আর বাঙালিরা তো আরও কম। আমাদের ক্যাম্পাসের আশেপাশেই থাকতেন কয়েকটি বাঙালি পরিবার এপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে। সকলেই প্রায় পোস্ট ডক্টরেট করতে এসেছেন অল্পদিনের মেয়াদে, কারণ ভিসা সম্বন্ধে তখন অনেক বেশি নিয়ম কানুন ছিল। তবে এই সুদূর প্রবাসে আমরা তখন সকলেই উন্মুখ থাকতাম বাংলা কথা বলবার জন্য, তাই পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব হতে দেরি হতনা বিশেষ। আমার এই নতুন পাওয়া দাদা বৌদিরা প্রায়ই শনি রবিবারে নিমন্ত্রণে ডাকতেন আমাকে এবং অন্যদের, আর গানে গল্পে খুব সুন্দর সময় কাটত আমার ছুটির দিনগুলিতে আবার পড়াশুনার প্রচণ্ড চাপের মধ্যে খানিক নিঃশ্বাস নেবার অবকাশও মিলত।

আমার সবচাইতে ভাল লেগে গিয়েছিল বরুণ দা কে ; ভদ্রলোক কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশুনো করেছেন, অত্যন্ত সরল মানুষ আর অন্যকে সাহায্য করতে সবসময় প্রস্তুত। যখনই একটু সময় পেতাম বরুণ দার সঙ্গে গল্প করতাম। উনি আমাকে নিজের জীবনের অনেক কথাও বলেছিলেন; কেমন করে দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে উনি বড় হয়েছেন , নিজের বাবা মা ভাই বোনদের বাঁচিয়েছেন এইসব। যতই শুনতাম বরুণ দার প্রতি শ্রদ্ধা আমার ততই বেড়ে যাচ্ছিল। একদিন ফোনে বরুণ দা গল্পচ্ছলেই বললেন, " জানত মিলন একটা সুখবর আছে, তোমাদের বৌদির ভিসা হয়ে গেছে এবারে শীঘ্রই এখানে চলে আসতে পারবে "। আমি একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম এই ভেবে যে উনি কখনও বলেননি যে উনি বিবাহিত। তবে এও ভেবেছিলাম

যে আমাদের পরিচয় তো মাত্র কয়েক মাসের এরই মধ্যে সব কথা কি বলে ওঠা যায় ? তখনও জানিনা আমার জন্য কত বড় চমক বাকি ছিল।

বরুণ দা ডিনারে ডাকলেন আমাকে আর আরও কয়েকটি পরিবারকে এক শনিবার সন্ধ্যায় ওনার স্ত্রী এসে পৌঁছোবার পর। আমি তখন উইক-এন্ড গুলিতেও ল্যাবে গিয়ে কাজ করি অনেক রাত অবধি , তবে সেদিন বিকেল থাকতেই ফিরে এসে তৈরি হয়ে নিলাম আর বরুণ দার বাড়ি যাবর পথে রাস্তার মোড়ের ছোট্ট দোকান থেকে কিনে নিয়েছিলাম এক গুচ্ছ মরশুমি ফুল নতুন বৌদিকে দেবার জন্য।
বরুণ দার অ্যাপার্টমেন্ট টা সেদিন খুব সযত্নে সাজান মনে হয়েছিল, তবে অবাক হবার তখনও কিছু বাকি ছিল। বৌদিরা সকলে মিলে রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন , দারুণ দারুণ সব সুস্বাদু বাঙালি খাবার তৈরি করতে। খাবর পরিবেশনের ঠিক আগে বরুণ দা রান্নাঘর থেকে ডেকে নিয়ে এলেন নতুন বৌদিকে, সবার সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্য, আর আমি এই নতুন বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে ভীষণ ভাবে আশ্চর্য হয়ে গেলাম কারণ এই মুখ ছিল আমার বিশেষ চেনা, সেই খড়গপুর থেকে ট্রেনে ওঠার সময় থেকে। নতুন বৌদি কিন্তু আমাকে কোনদিন দেখেছেন এমন ভাব দেখালেন না তাই মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন জাগলেও আমি সৌজন্যের খাতিরে নীরব থাকলাম।

রিসার্চের কাজে ব্যস্ততা ক্রমেই বেড়ে চলছিল এই সময়টাতে, ল্যাব থেকে ফিরতে অনেক রাত হোতো। আমার ছোট্ট ওয়ান রুমের বাড়িটা ছিল আমার অফিস থেকে মাত্র চার কি পাঁচ ব্লকের হাঁটা পথের দূরত্বে। এমন কিছু দুর নয়, তবে আমেরিকার বড় শহর রাতের দিকে নিরাপদ ছিল না কোনও দিন। এমনই একদিন রাতে বাড়ি ফিরছি, তখন বোধহয় সময়টা ছিল হেমন্তকাল , এখানকার Fall semester সবে তখন সুরু হয়েছে । সেই রাতে আবার টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল আর সোঁ সোঁ করে বেশ হাওয়াও দিচ্ছিল। রাস্তাগুলো এমনিতেই অবশ্য এত রাত বলে ছিল খুব নির্জন। আমার একটু একটু গা ছম ছম করবার দরুন লম্বা লম্বা পা ফেলে চলছিলাম, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে কিছু দূরে মোড়ের টেলিফোন বুথ থেকে একজন সাড়ি পরা মহিলা বেরিয়ে আসছেন। তখনকার দিনে সেলফোন বা ইন্টারনেট মানুষের ধারনার বাইরে ছিল। পথেঘাটে সেইজন্য টেলিফোন বুথ দেখ যেত। আমার খুব ক্লান্ত লাগছিল সেদিন , তবু ভাবলাম এত রাতে এমন বিপদজনক এলাকায় একা একজন ভারতীয় মহিলাকে দেখেও চলে যাওয়া বোধহয় ঠিক হবেনা তাই অনিচ্ছা স্বত্বেও বুথের দিকে এগুতে হোল। কাছে গিয়ে দেখি টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে আমার দিকেই এগিয়ে আসছেন যে মহিলা তিনি হচ্ছেন আমাদের খড়গপুরে ট্রেনে দেখা বুলু বা আমার এখনকার নতুন বৌদি। আশ্চর্য হলাম দেখে যে এখন উনি আমাকে চিনতে পারলেন আর বলে উঠলেন, " প্লিজ মিলন একটু সাহায্য কর, ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি, বাড়ি ফেরার পথ চিনতে পারছি না। আমার লাইফে কিছু গোলমাল চলছে, তাই এসেছিলাম টেলিফোনে এক বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করতে, বাড়ী থেকে তো সব কথা বলা যায় না"।
ভেবেছিলাম এই বিদেশে এত কাছের বন্ধু কে থাকতে পারে বুলু বৌদির যাকে এই মাঝ রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফোন করছেন ? গোলমালই বা কিসের এত ? কিন্তু এসব প্রশ্ন একজন অল্প চেনা ভদ্র মহিলাকে করা যায়না , তাই সেদিন শুধু বুলু বৌদিকে ওদের বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরেছিলাম মুখে কিছু না বলে।

এর পরে বার দুই তিন বুলু বৌদি আমাকে ফোন করেছেন। উনি নাকি বরুণ দার নোটবই থেকে আমার নম্বর পেয়েছেন। প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন আগেকার সকল অভদ্রতার জন্য, নানারকম যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে। তারপরে বলেছেন এখনকার সমস্যার কথা, বক্তব্য হল সেই ষড়যন্ত্র ।ঠিক কি সমস্যা সেটা খুলে বলেননি কোনোদিন , বা আমি ঠিকমত বুঝতে পারিনি হয়ত , তবে আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল যে বুলুবৌদির বক্তব্যে কোথাও একটা অসঙ্গতি আছে। কোথায় সেটা অবশ্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি। এদিকে বুলুবৌদ যদিও প্রকাশ্যে বলেন নি তবে পরোক্ষে ইঙ্গিত করেছেন যে বরুণ দাও এর মধ্যে জড়িত। আমি কি বলব বা করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। মেনেও নিতে পারছিলাম না বুলুবৌদির অভিযোগ আবার না

পারছিলাম বরুণ দা কে কিছু বলতে । । ফলে দুজনকেই এড়িয়ে চলছিলাম । আবার এও ভাবছিলাম আমি কি ভুল বুঝছি বুলুবৌদিকে ? তবে কি বরুণ দার অন্য একটা রূপ আছে? তা হলে তো সত্যই বুলু বৌদির সাহায্যর প্রয়োজন।

দিন গুলো অবশ্য ঠিকই কেটে যাচ্ছিল নানা কাজে। এর ভিতরে হয়ত আবার কারুর বাড়িতে আমাদের সবার নিমন্ত্রণ থাকত, কখনও দেখতাম বুলু বউদি আর বরুণ দাও এসেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে, দুজনেই বেশ হাসিখুশি, সকলের সঙ্গে মেলামেশা করছেন । সমস্যার কোনও লক্ষণ দেখতাম না । মাঝে মাঝে মনে হত বুলুবৌদি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন ?
এর পরেও বুলু বউদি বোধহয় কয়েকবার আমায় ফোন করে একই ধরণের কথাবার্তা বলে থাকবে এতদিন পরে ভাল করে মনে নেই । কয়েক মাস পরে খেয়াল হয়েছিল যে বেশ কিছু দিন ওদের কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখিনি । একটু চিন্তাও হচ্ছিল ওদের জন্য । আগের মত যখন তখন ফোন করতে অস্বস্তি লাগত এই ভেবে যে বরুণ দার সম্বন্ধে আমি বুলুবৌদির কাছ থেকে অনেক অভিযোগ শুনেছি , যা সত্যি নাও হতে পারে, সেসব কথার সততা যাচাই করতে যাওয়া সম্ভবও নয়, এদিকে বরুণ দা যদি জানতে পারেন যে আমি এসব শুনেছি , তাহলে আমাকেই বা কি ভাববেন উনি ? আমার কেবল মনে হত যে আমি বরুণ দার বিশ্বাস ভেঙেছি । এই কি একজন বন্ধুর কাজ ? সেই দিনগুলিতে আমি অপরাধ-বোধে ভুগছিলাম।

কিছুদিন পরে একদিন রাস্তায় বরুণ দার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, বরুণ দার চেহারা টা আমার চোখে ভাল ঠেকল না, কেমন যেন চোখের কোলে কালি, পরিশ্রান্ত ধরণ ধারণ । উনি আমকে জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন মোড়ের কফির দোকানে, বললেন , " মিলন তোমার সঙ্গে কথা আছে, " আমার তো খুব নার্ভাস লাগতে লাগল কি বলবেন ভেবে । বরুণদা অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর যা বললেন তার জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না । বরুণ দা বললেন, " মিলন আমার বোধহয় এবারে এখানকার বাস তুলতে হবে" । আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম তবে বরুণ দা আমার কথা শুনলেনই না যেন । বরুণ দা সেদিন নিজের কথাতেই ব্যস্ত থাকলেন , প্রথমেই বললেন যে, " তুমি সংকোচ করোনা মিলন , আমি জানি যে বুলু তোমার কাছে অনেক কথা বলে হাল্কা হয় আর তাতে ওর মনটা ভাল থাকে, তাই ওর কথা শোনবার জন্য, ওকে সাহায্য করবার জন্য তোমার কাছে আমি যে কতটা কৃতজ্ঞ তুমি জাননা " । আমি বলেছিলাম, একি বলছেন বরুণ দা, কি এমন সাহায্য করছি? একে কি আদৌ সাহায্য করা বলে ? কিন্তু বরুণ দাকে সেদিন কথায় পেয়েছে, আমার কথায় কান না দিয়ে উনি বলেই চললেন, মিলন আমি বুলুর কষ্ট দেখতে পারিনা, ওকে সুখে আর আনন্দে রাখতে চাই, ছোটবেলা থেকে বুলু অনেক disappointment face করেছে, ওর মার ও এই রকম যখন তখন মন খারাপ হত, তারপরে তো চলেই গেলেন । স্কুলে পড়বার সময় বুলুর কোনদিন কোনও বন্ধু হয়নি । আমি ওর মামাতো দাদাদের অঙ্কের প্রাইভেট মাষ্টার ছিলাম তাই বুলুকে ওর ছোটবেলা থেকেই জানতাম । বিয়েটা আমরা নিজেদের পছন্দেই করেছি । ভেবেছিলাম নতুন দেশে এসে বুলু আনন্দে থাকবে তবে সেটা তো হচ্ছেনা । ওর মনের ভিতরে নানা সংশয় ও অশান্তি চলছে । আমি কোনমতেই ওকে কথা বলে বুঝিয়ে ওর মানসিক শান্তি এনে দিতে পারছিনা । তাই চেষ্টা করছি জায়গাটা বদলাবার, একটু গরম আবহাওয়াতে হয়ত বুলুর ভাল লাগবে, যখন ও ইচ্ছেমত বাইরে বেরুতে পারবে । এখানে ঠাণ্ডার জন্য সবসময় বাড়িতে বন্দি থাকে । নর্থ ক্যা।রোলিনার একটা ইউনিভার্সিটিতে একটা পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের চেষ্টা করছি, সম্ভবত: পেয়ে যাব মনে হয় । তবে তোমার ঋণ কখনও শোধ করতে পারবনা মিলন, বরুণ দা আমার হাতদুটো নিজের হাতের মুঠিতে ধরলেন দেখলাম ওনার হাত ঠাণ্ডা, চোখ দুটো কেমন যেন লালচে ।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরলাম, বরুণ দার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিতে মন তখন ভরপুর । এর দুদিন পরে বুলু বউদির ফোন এসেছিল, সেটাই বোধহয় লাস্ট ফোন, বুলু বউদির গলা এর পরে আর কোনোদিন শুনতে পাইনি, বুলু বউদি সেদিন বলেছিল যে সে আরও বড় ষড়যন্ত্রের শিকার হতে চলেছে এবারে , কারণ তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এক সম্পূর্ণ নতুন জায়গাতে, এইজন্য যে তার এখানে বন্ধু ও support system গড়ে উঠেছে তাই কোন ক্ষতি করা তো সহজ হবেনা । আমি সেদিন ভেবেছিলাম বুলু বউদি কি আবোলতাবোল বকছে, বরুণ দার এদিকে চেষ্টার ত্রুটি নেই বুলু বউদিকে ভাল রাখবার জন্য , তাই আর কথা বাড়াইনি । সামান্য সৌজন্য বিনিময়ের পরে ফোনটা রেখেই দিয়েছিলুম ।

নর্থ ক্যারোলিনাতে ওরা ছিল বছর দুই কি তিন, মাঝে মাঝে বরুণ দার সঙ্গে ফোনে আড্ডা হত, জন্মদিন বা বড়দিনে আসত দুজন কারই নাম সই করা কার্ড, বরুণ দাকে ফোনে হাসিখুশিই মনে হত, কোনও serious কথা অবশ্য হয়নি। এর পরে দুপক্ষ থেকেই ফোনের সংখ্যা কমেছিল আর আমিও পি এইচ ডি শেষ করে আরও উত্তরের একটি ছোট্ট শহরে চলে গিয়েছিলাম ইউনিভার্সিটিতে পড়াবার চাকরি নিয়ে। যাবার আগে বরুণ দাকে তাড়াতাড়ি তে একটা ফোন করেছিলাম আর বরুণ দা প্রাণভরে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। নতুন শহর , নতুন চাকরি নানারকমের adjustment এর পরে যখন সময় হয়েছিল ফোন করবার তখন মাস ছয়েক কেটে গেছে। বরুণ দাদের আর আমি ওই ঠিকানাতে পাইনি , খোঁজ করতে করতে আরও ছয়মাস কেটে গিয়েছিল , পরে জানতে পারলাম ভিসা শেষ হয়ে যাবার জন্য ওরা দেশে ফিরে গেছে। দেশের সঠিক ঠিকানা কেউ দিতে পারল না। তখনই মনে পড়ল যে আমার নতুন ঠিকানা বা ফোন নাম্বার তো বরুণ দার জানা ছিলনা। ই মেল, ইন্টারনেট, সেলফোন এসব তখন মানুষের ধারনার বাইরে তাই এত-বড় জগতে কেউ হারিয়ে গেলে তাকে তখনকার দিনে তাকে খুঁজে বার করা সহজ ছিলনা।

ঘটনাচক্রে আমি আবার আমার পুরনো শহরে ফিরে এলাম বছর দুই পরে , এবারে একই ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক হিসেবে । একদিন আমার ইউনিভার্সিটির ঠিকানাতে পেলাম বুলুবৌদির লেখা একটি এয়ারমেল। সেটাই ছিল বুলুবৌদির সঙ্গে লাস্ট যোগাযোগ।

বুলুবৌদি লিখেছিলেন ," মিলন , তোমাকে এক সময় অনেক বিব্রত করেছি, বিরক্ত করেছি ষড়যন্ত্রের গল্প শুনিয়ে , আমার স্বামী বরুণের বিরুদ্ধেও কত অভিযোগ করেছি। তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল যে তুমি আমার বন্ধু হবে, আমাকে বন্ধুত্বের মর্যাদা দেবে , কারণ কেউ আমায় বোঝে না ছোটবেলা থেকে। আমার কোনদিন কোন বন্ধু হয়নি, কেন না আমার কারুকেই বিশ্বাস করতে মন চায় না ,ভয় হয় বিশ্বাস ভেঙে যাবার। ।ছেলেবেলায় আমার মা ছিল আমার সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য কাছের মানুষ, সেই মা আমায় ছেড়ে গিয়েছিল কিছু না বলে। এরপর থেকে আমি বিশ্বাস করতে সুরু করলাম যে অন্যরা ষড়যন্ত্র করে মা কে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সবাই বলতে লাগল এ আমার কল্পনা, মানসিক শক থেকে এরকম হয়েছে, কিন্তু আমার কাছে এটা আমার বিশ্বাসে পরিণত হল। তোমাকে যত কথা আমি বলেছি , তার সবটাই আমার কাছে সম্পূর্ণ সত্যি, তবে অন্যের কাছে মিথ্যা হতেও পারে , কারণ আমার কাছে কোনদিন কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিলনা আমার অভিযোগগুলির, বা আমার নিজস্ব বিশ্বাসের হয়ত কোন ভিত্তি ছিল না। তাই তোমার সবটা জানা দরকার ছিল। তোমাকে সত্যিটা না জানাতে পারলে আমি শান্তি পাচ্ছিলাম না। যদিও রিয়ালিটি সম্পর্কে আমার নিজের ধারনাই এখন অস্পষ্ট। আমার পরিবারের লোকজন এমনকি আমার স্বামী বরুণ ও আমার কথা বিশ্বাস করেনা, ওরা মনে করে সবই আমার মনগড়া কল্পনা, ভাবনা-বিলাস বা মনের অসুখ। ওরা আমাকে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিয়ে গেছে বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে, আমার ধারনাগুলো ভুল প্রমাণ করবার জন্য। এটা ও তো এক রকমের কন্সপিরেসি, আমার বিরুদ্ধে নয় কি ? তাই যখন ডাক্তারদের কেউ কেউ দিয়েছেন ওষুধ, আমি সেই সব ওষুধ সবাইকে লুকিয়ে ফেলে দিয়েছি না খেয়ে। আমি যে বদলাতে চাই না, নিজের চিন্তা ভাবনা নিয়ে নিজের মনের জগতেই বাস করতে চাই। তবে তোমার কাছে একটাই শেষ অনুরোধ রইল যে প্লিজ আমার কথা শুনে তোমার বরুণ দা কে ভুল বুঝ না, আর পারলে আমায় ক্ষমা করে দিও।

চিঠিটা বোধহয় বৃষ্টির দিনে এসেছিল , কয়েকদিন পড়েও ছিল বুঝি মেল বক্সে , বুলুবৌদির ঠিকানাটা এমন করে জল লেগে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল যে কিছুতেই সেটা পরিষ্কার হোলনা।

Amphora Vase by Anika Kumbhakar

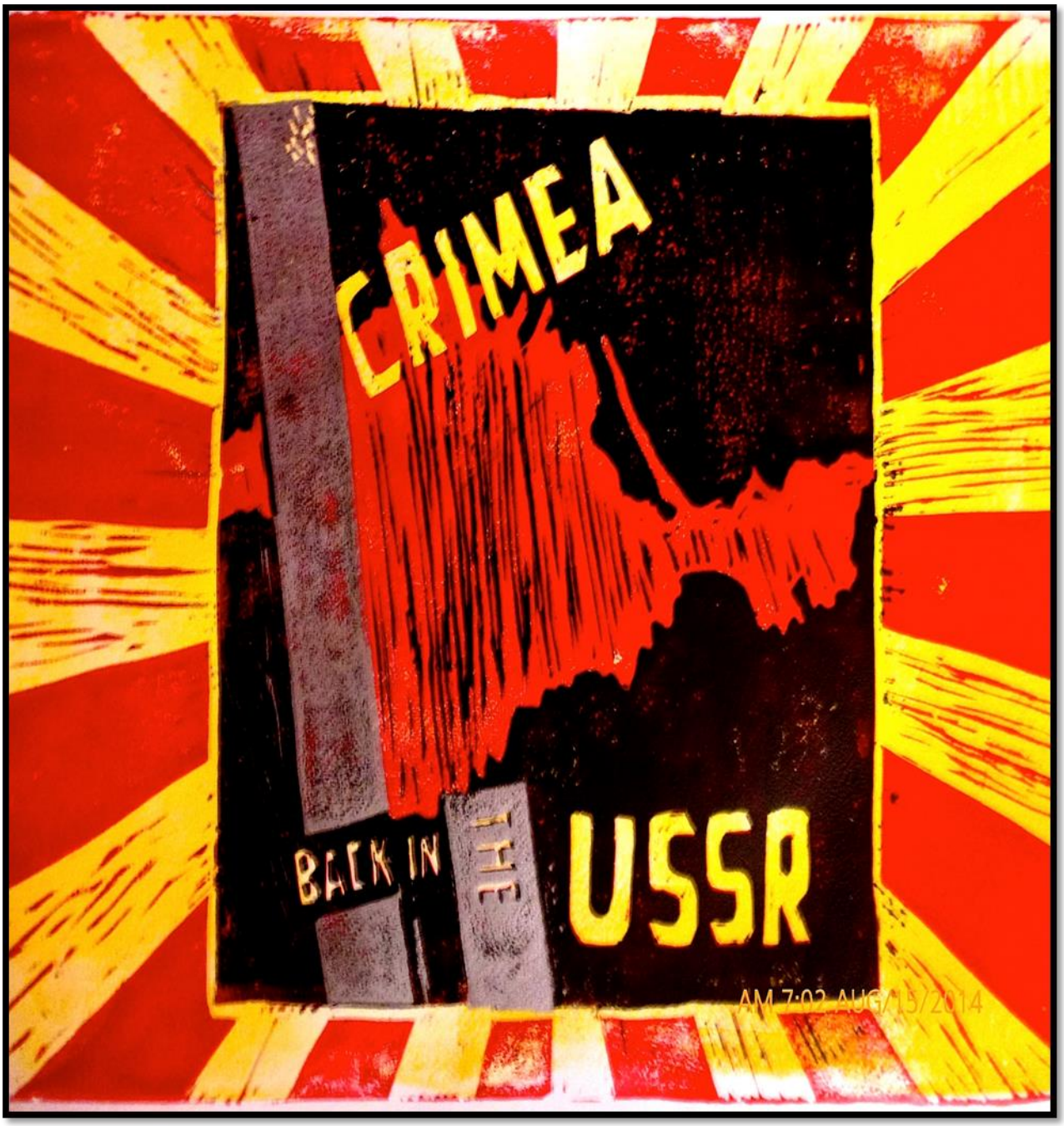

"Back in the USSR", a linoleum print - Ishika Kumbhakar

- Painting by Roshni Ray

Painting by Shikha Ray -

Paper Quilling art - Sohini Chakraborty

MARK TWAIN IN HISTORIC ELMIRA

Vaswati Biswas

Elmira is a small town in the Finger Lake region of upstate New York. It was officially chartered as a city on April 7, 1864 and the queen city is celebrating 150th anniversary this year.

Elmira was a transportation hub for the Southern Tier in 1800s, connecting commercial centers in Rochester and Buffalo with New York City, via railroads and canal system. With influx of businesses came prosperity for Elmira and it flourished into an industrial city. Several eminent residents in the 19th and 20th centuries had left an imprint on Elmira. One of the most famous residents was Samuel Langhorne Clemens, also known as Mark Twain, the world renowned author and humorist. His literature and life were entwined with his summer home in Elmira, New York.

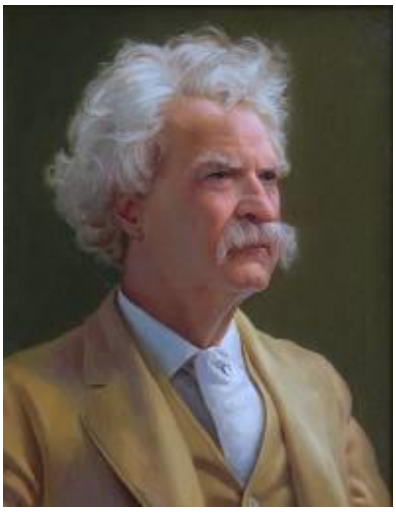

Samuel Langhorne Clemens

He first visited this area in 1868 for courtship with Olivia Langdon, daughter of Jervis Langdon, a coal industry baron and wealthiest man in Elmira. Twain and Olivia married in 1870. They settled in Hartford, Connecticut, but visited Elmira for 20 summers and created his classic American literature there. During the summer-family visits, Mark Twain and his family stayed with his sister in law, Susan Crane at the Quarry farm nestled in the east hill of Elmira. Susan Langdon Crane inherited the vacation home when her father Jervis Landon died in 1870.

Olivia and Samuel had three daughters, Susan, Lucy and Jean. All three were born in the Quarry farm of Elmira.

Mark Twain with his wife Livy and 3 daughters: Clara, Jean and Suzy

The Clemens family enjoyed the summer escapades from Hartford's oppressive heat and demanding social scene. Olivia spent her days with Cranes and visited her

parent's home in downtown Elmira, girls spent time in their playhouse, enjoyed the outdoors. Meanwhile Twain's mind danced with ideas and penned his thoughts at furious pace in the Quarry farm He described this tranquil Quarry Farm in his letters as "the quietest of all quiet places".

Summer Home in Quarry farm

Susan and Theodore Crane surprised their brother-in law Samuel Clemens with a beautiful study in 1874. The study mimicked the pilot house of Mississippi river steamboat. It perched on a knoll 200 yards away from the farmhouse overlooking the Chemung river valley. The study was a wooden octagonal shaped building with glass windows on all eight sides and a cozy fireplace, sofa, a writing table with few chairs inside.

Mark Twain study on Elmira College campus

Mark Twain loved his study and was flattered by this thoughtful gift. He wrote about the grand view from his study window "an elevation that commands leagues of valley and city and retreating ranges of distant blue hills." Twain spent uninterrupted writing sessions from mid-morning till early evening, often skipping lunch in his beloved study. He was fond of cigars and smoked almost 30 to 40 cigars with his favorite pet cats in this tiny octagon and gave the world, classics like adventures of Huckleberry Finn and Tom Sawyer, Roughing It, The Prince and the Pauper, A Connecticut Yankee in King Arthur's Court and several literary pieces. When Samuel l. Clemens, his wife Olivia and daughter Clara left for a year for Twain's world lecture tour in July 1895, Mark twain's younger daughters, Suzy and Jean stayed at quarry farm with their aunt. Jean attended Elmira college preparatory school. Samuel Clemens visited India for 3 months in 1896. He travelled to several cities including Kolkata. He wrote "in religion, all other countries are paupers. India is the only millionaire".

The Mark Twain study was relocated in the 1950s from the Quarry farm to Elmira college campus next to a serene pond for tourist display. It's a powerful place showing Twain lovers where he did his best works. There are statues of Mark Twain and his wife Olivia on Elmira College campus and Mark Twain exhibits in Cowles Hall, Elmira College. Many people do not know Elmira College was the first college to grant degrees to women in America. Clemens' wife Olivia was a student of this college. Her

intellectual and progressive upbringing was a major influence on Samuel Clemens and his writings.

Mark Twain statue on Elmira College campus

Now the peaceful Quarry farmhouse on the outskirt of Elmira serves as a home for visiting Mark Twain scholars. Although the summer home is not open to the public, one can visit the house from outside and see the porch where Clemens used to sit every evening to read his day's work to the family or bask in the glory of the scenic view of "distant blue hills" as Twain described.

Elmira provided Twain with solace to bloom, producing 7 novels but the town also represented the end of his family. Mark Twain is buried with his wife and children on the hill at Woodlawn Cemetery, Elmira. Clemens infant son Langdon died at 19th months, his daughter Suzy died of meningitis when she was 24, his wife Olivia died at 58, his epileptic daughter Jean died at 29, when drowned in a bathtub on Christmas Eve. It was this family sadness ultimately drew Mark Twain away from Elmira; he could not come back after his doting daughter Suzy's death in 1896. His last visit to Elmira was in 1907 for the dedication of a new organ at Park Church. Samuel Clemens' final summer sojourn to Elmira came when he was laid to rest in 1910.

Mark Twain's Grave

This enchanting place created magic for Mark Twain. He was a citizen of the world, but his literature nurtured in the picturesque surroundings of Elmira. In writing about the Chemung River from his rocking chair each summer night, he penned his feelings for Elmira,"And every now and again, she'd belch a whole world of sparks up out of his chimney. And they would rain down in the river. And look awful pretty".

"If you tell the truth you don't have to remember anything." Mark Twain

This writing is dedicated to sesquicentennial celebration of Elmira

Mark Twain Monument, Woodlawn cemetery

1864-2014

Newspapers and Magazines – The Best Learning & Teaching Tool

Amalendu Chatterjee, Ph.D

Some people read and find pleasure in newspaper or magazine articles and some people write articles and create news items for others. Some are both readers and writers. One has to be a good reader to be a good and creative writer. Writers also take initiatives and become motivated while writing articles and news items. Here is an article I wrote for the local newspaper on their 120th birth day of the local paper's circulation. I thought sharing the article for the Puja Magazine may motivate others to explore the usefulness of such readings and writings.

We did not go a day without the N&O (local newspaper) since we moved in NC in 1987. Our initial thought was that if you do not have friends in a new place, the newspaper could be a friend and also can help making a friend of common interests. The N&O was the source of social, political, cultural, educational, recreational and other activities. It helped us to choose best schools for our children. In addition, we used it as tools for our children in the following ways:

- Learning – Parents and children learnt many things together. We chose N&O items of modern topics for dinner table discussions for all family members. Areas selected were mostly of national and international interests. Surely, we all benefitted to enhance our communication skills among ourselves and also with the community in a short period.

- Teaching – Children used the N&O to improve their skills on many subjects such as writing style, use of similar words in different sentences, new math, social and history studies. Weather news was used to enhance knowledge on the climate change. It was easy to choose topics to teach subjects at different grade levels; even the subject of teaching itself.

- School Project - The Mini Page of the N&O was especially useful to generate ideas for children's school projects: social, mathematical, scientific and historic. Such projects developed competitive skills among children to succeed. Such success motivated them to do more beyond the class level studies.

The habit of reading a newspaper or a magazine was instilled in us by our parents. That is what we tried to instill in our two boys who are Harvard and Princeton graduates. Results of such habit carry success stories for our children. This, in our judgment, helped them to be well rounded students in many subjects with above average GPA.

Unfortunately, we do not see the use of the traditional printed paper same way by the Generation X and the Generation Y. There is information explosion in social media going beyond core educational values of science, math and basic social studies. We are in the digital world and N&O has to adjust to the new paradigm – changing life style (fast pace of information and news exchange). But the role of N&O cannot change even in the digital world or in the new media. The main role of the digital newspaper must stay the same – a tool of learning, teaching and idea generation as the traditional printed one. The difference may be in the new digital design that is cloud based; same information being available and minable with a new framework.

Tami in Cairns

Ashish Mukherjee

Not all mornings are the same.

Most are daybreeaks. “A few like this are revelations”, Anil thought as he sniffed the pre-dawn air.

From his hotel balcony he looked out on his first morning in the Southern hemisphere. A low mountain range skirted Cairns bay all the way to where it poured into the wide Pacific. Locals call it Trinity Outlet. Boats of various shape dotted the still water, waiting to float away into the rising sun. There was scarcely a sound except the chirping of early birds and footseteps of an occasional jogger. Looking at the harbor backlit by the liquid sun, Anil thought he was a voyager himself.

Cairns is a picturesque city in the tropical North of Queensland, Australia. Founded in 1876 as a port city, its importance has now shifted to tourism. It is the gateway to Great Barrier Reefs the world’s largest coral system stretching over 1400 miles.

Tami was still in bed, savouring the bliss of slumber.

For her, mornings were of two types – working or holiday. The best parts of her vacation were sleeping till late, heavy omlettes, and expensive clothes.

Their journey began at Cairns harbor.

Speed of life here follows the speed of sea. People had woken up to another day of tasting the ocean. Even the smallest boat that had harbored for the night was ready to sail off. Tami and Ani boarded a large catmaran that would take them to Green Island in only an hour. This is a low sandy island within the Great Barrier Reef Marine Park. It had a wonderful beach, crystal clear waters to snorkel in, and a rain forest. Strolling along the Boardwalk in the forest was be fascinating. The island was also full of an unusual number of birds totally unafraid of humans, probably because they were legally protected.

Tami was looking well. She enjoyed that feeling and kept on taking selfies. Her favorite exclamation is “honestly” which she applies with equal effectiveness to things she likes and hates. It was quite hard for Tami to eat her sandwich, as the birds kept trying to peck at it.

‘Honestly!” said Tami, “I could never imagiine a little bird could snatch a french fry out of my hand?”

Trips to see the Reef formation start form here. “The Great Barrier Reef is one of the seven wonders of the natural world. It is larger than the Great Wall of China and the only living thing on earth visible from space.” It is the world’s biggest structure composed of living organisms called coral polyps. The earliest evidence of complete reef structures date back to 600,000 years ago.

The two most common modes of seafaring are glass bottom boats and partial submarines. Tami tried both. They plunged into a world they had not known so far. Large shoals of fish went by them and turned around in synchronization to look at them. Their eyes had no expression but their skins were shiny and came in vibrant colors. A few large turtles were restng on corals, barely moving. The corals resembled a submarine mountain range. Most striking was the fact that they were alive. They came in all sapes and colors. Some were called broccoli, some were named spaghetti and yet other were known as blue corals. They moved gently with the waters and appeared as though they were breathing.

“Honestly”, thought Tami “It almost seems a mermaid would swim out from the deep and greet us to her palace!”

The trip ended too soon, and It was time to reurn to the large catamarran for a meal and the trip back. After a heavy buffet, soon they were dozing in the sultry afternoon sun.

Tami had enjoyed the day thoroughly. But she had no time for people who did not meet her standards. The cataamarran was full of tourists who were barely trying to keep their brawling children under control. She tried to hug her Nordstrom jacket tighter to strengthen her separation from such lack of class! Finally when a misguided child in a moment of puerile triumph spilled his juice on Tami’s dress, she just could not believe it. “Honestly”, she said “I hope people do not think I am one of them?”

The journey came to an end. There was a mad rush to get off, and Tami hoped fervently that she looked and behaved differently from unruly tourists from her part of the world.

There was a friendly stewardess who was waving everyone off the shp with a pleassant “goodbye, hope you enjoyed your trip”.

When Tami stepped out on the plank, she came up to greet her and said gleefully “Namaste! Did I say that right?”

It was my turn to say “Honestly, that was sharp!”

Pictures

1) Dawn at Cairns bay 2) Cairns Harbor 3) Green Island Boardwalk 4) and 5) Corals in GB Reef.

Committees	Participating Members
Finance	Utpal Roychowdhury, Dilip Hari, Sambit Saha, Pranab Datta, Samir Biswas.
Publicity	Utpal Roychowdhury, Pranab Datta, Dilip Hari, Samir Biswas, Ashim Datta, Parveen Paul, Sambit Saha, Aniruddha Banerjee, Manas Chatterji.
Puja Website	Anju Sharma.
Puja Magazine	Pradipta Chatterji, Utpal Roychowdhury, Sujoy Chakraborty, Sohini Chakraborty.
Puja Ayojon	Amol Banerjee (Priest), Aniruddha Banerjee, Vaswati Biswas, Damayanti Ghosh, Sheema Roychowdhury, Pradipta Chatterji, Anasua Datta, Anju Sharma, Manashi Paul, Shamla Chebolu, Abha Banerjee, Maitrayee Ganguly.
Prasad & Bhog	Vaswati Biswas, Subol Kumbhakar, Pradipta Chatterji, Sheema Roychowdhury, Damayanti Ghosh, Manashi Paul, Shamla Chebolu, Sohini Chakraborty.
Decoration	Damayanti Ghosh, Anju Sharma, Vaswati Biswas, Sohini Chakraborty, Parveen Paul.
Lunch & Dinner	Dilip Hari, Subal Kumbhakar, Samir Biswas, Ashim Datta.
Pratima Transfer	Sambit Saha, Subal Kumbhakar, Samir Biswas, Sujoy Chakraborty.
Local Artist Cultural Program	Ruby Biswas, Biru Paksha Paul.
Invited Artist Cultural Program	Dilip Hari, Sambit Saha.
Audio Visual Setup & Stage Management	Sambit Saha, Bijoy Datta, Aniruddha Banerjee, Sujoy Chakraborty.
Hall management	Samir Biswas, Sambit Saha, Dilip Hari, Sheema Roychowdhury, Anju Sharma, Maitrayee Ganguly.
Reception	Utpal Roychowdhury, Samir Biswas, Sambit Saha.
Cross Functional Coordination	Utpal Roychowdhury, Sambit Saha, Pranab Datta, Dilip Hari, Samir Biswas, Subal Kumbhakar.
Patrons	Arindam Purakayastha, Manas Chatterji, Kanad & Indrani Ghosh, Subimal & Sudipta Chatterjee, Hiren & Dipali Banerjee, Sumit & Sudeshna Ray, Lopamudra & Subasit Acharaya, Raman & Shasi Daga, Natwar Pareek.

Greater Binghamton Bengali Association: 2014

Saturday, September 27, 2014

Durga Puja Programs

Morning Session:	
8:00 AM - 12:30 PM	Puja (Pushpanjali at 12:15 PM)
12:30 PM - 1.30 PM	Prasad + Vegetarian Lunch
1:30 PM - 2:00 PM	Dashami Puja + Pushpanjali + Bisharjan
2:00 PM - 2:30 PM	Sindoor Utsab + Bijoya + Dhak

2:30 PM - 6:00 PM	Break
Evening Session:	
6:00 PM - 6:30 PM	Sandhya Aarti
6:45 PM - 7:30 PM	Local Talent Showcase (Direction: Ruby Biswas and Biru Paksha Paul)
8:00 PM - 9:15 PM	Dinner
9:30 PM -11:30 PM	Invited Artist, Mampee Nair

Greater Binghamton Bengali Association
invites you with your family and friends to
Durga Puja 2014
On September 27
Venue: Indian Cultural Centre,
1595 NYS Route 26, Vestal, NY 13850
Puja Contribution:
General Contributors:*
$50 per family (for entire event)
$30 per person (for entire event)
$10 full-time student (for entire event)
Free admission for children (18 years or less)
*covers lunch, dinner & entertainment
Patrons: $250/family, Donors: $100/family
A potpourri of songs and dances
Local talents will be showcased under the direction and choreography of Ruby Biswas.
The program is titled:
(The Universal Mother at the door)
Mampee Nair
Sa Re Ga Ma Superstar - 2010
Additional information including contact numbers are available at: www. Binghamtonpuja.org

Rangoli By Sohini Chakraborty

SORA painting By Sohini Chakraborty